দীপাবলি সংখ্যা ১৪২৮

বই কুটির কলকাতা

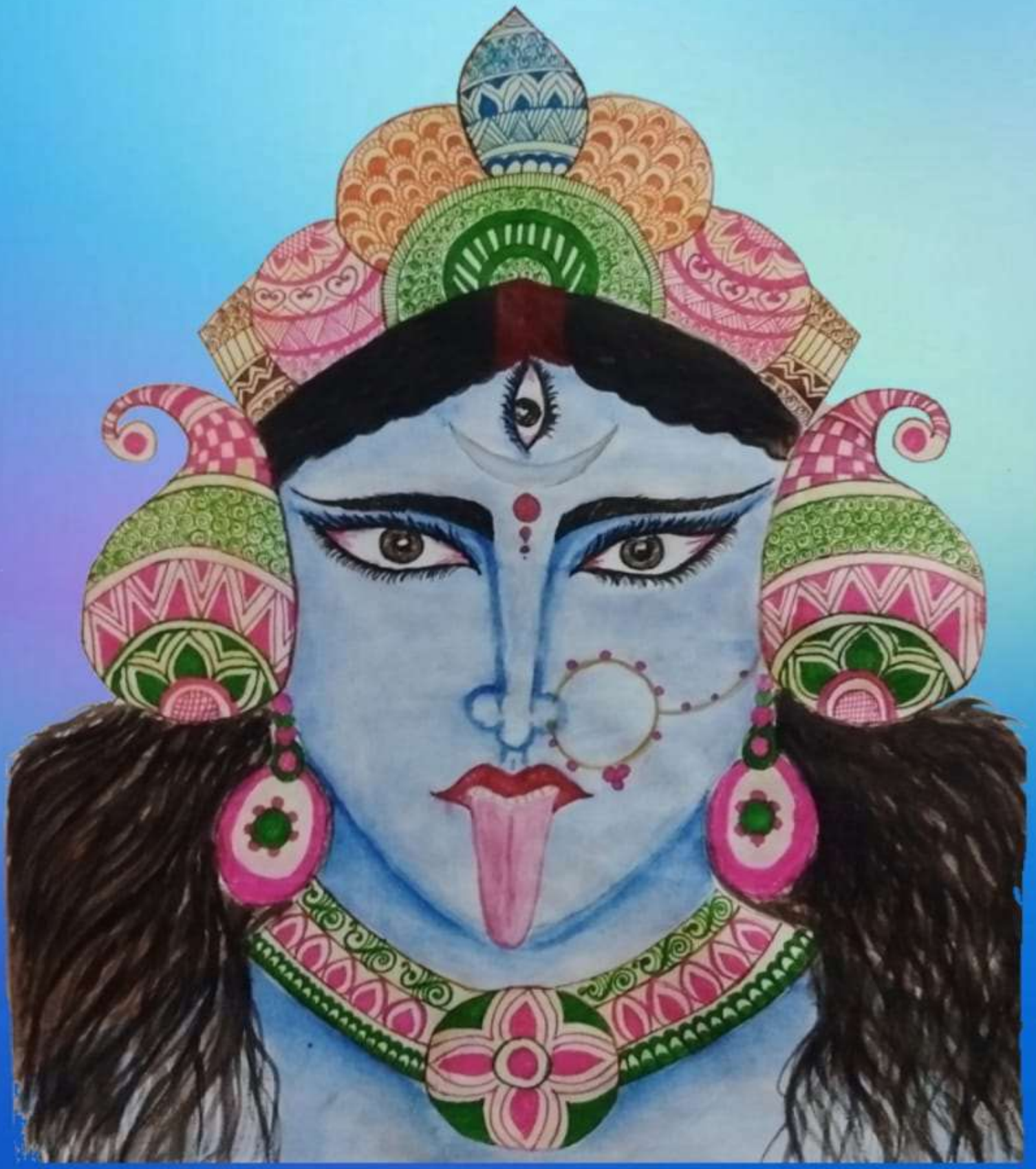

ভূমিকা

শারদ সংখ্যার সাফল্যের পর দীপাবলিতে আসছে '*বই কুটির কলকাতা*'র দীপাবলি সংখ্যা। ওয়েবসাইট 'বই কুটির কলকাতা'র আত্মপ্রকাশের পর যে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে, তা থেকেই অগ্রসর হওয়া আরও একটি সংখ্যা প্রকাশের। উৎসাহী লেখক-লেখিকা এবং অঙ্কন শিল্পীদের অনুরোধ করা হয়েছিল, দীপাবলি সংখ্যার জন্য লেখা ও আঁকা দিয়ে '*বই কুটির কলকাতা*' কে সমৃদ্ধ করার। যারা এই অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন তাদের কাছে '*বই কুটির কলকাতা*' কৃতজ্ঞ। যে সকল লেখক-লেখিকার গল্প-কবিতা শারদ সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারা যায় নি কোনো কারণে তাদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই সংখ্যায় চেষ্টা করা হয়েছে সেই অপূর্ণতাকে কিছুটা হলেও পূর্ণ করার। যে পাঁচজন '*বই কুটির কলকাতা*'র জন্মলগ্ন থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আসছে তাদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হল আরও একটি সংখ্যা। লেখক – পাঠকদের পাশাপাশি দীপাবলি সংখ্যার জন্য তারাও প্রশংসার দাবি রাখে।

দীপাবলি হল আলোর উৎসব। এই আলোর উৎসবকে আরেকটু আলোকিত করে তোলার এই সুযোগ। মনের কোণে সেই আলো জ্বলতে পারে নিজেদের অপ্রকাশিত লেখা ও আঁকা। যারা লেখালিখি করেন অথচ তা থেকে যায় ডায়েরি বন্দি, তাদের লেখাগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর '*বই কুটির কলকাতা*'। আপনারাই অনুপ্রেরণা। '*বই কুটির কলকাতা*' তো সহযোগিতার হাত বাড়িয়েই দিয়েছে, আপনাদেরও এগিয়ে আসতে হবে প্রবল ইচ্ছা শক্তি নিয়ে। যারা এই পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যেই তারা তো পাশে রয়েইছেন, অপেক্ষায় রইলাম নতুনদের।

***

সম্পাদকীয়

'***বই কুটির কলকাতা***'র পক্ষ থেকে সকল লেখক ও পাঠক বন্ধুদের জানাই শুভ বিজয়া। বড়দের প্রণাম, ছোটদের স্নেহ এবং সমবয়সীদের জন্য রইল ভালবাসা।

শারদ সংখ্যার পর, প্রকাশিত আরও একটি সংখ্যা। প্রকাশিত হল '***বই কুটির কলকাতা***'র দীপাবলী সংখ্যা। '***বুকক***' পরিবারের তরফে আলোর উৎসবের শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের।

আমরা আপ্লুত যে বছর দেড়েক আগে তৈরি হওয়া একটা যোগসূত্র যা পূর্ণতা পেয়েছে শারদীয়া সংখ্যায়, এবং সেই পূর্ণতা আরও দৃঢ় হল দীপাবলি সংখ্যা প্রকাশে। '***বই কুটির কলকাতা***' হল সেই যোগসূত্র। যে যোগসূত্র দৃঢ়তা পায় লেখক ও পাঠকের মধ্যের সেতু বন্ধনে। আশা করি, দীপাবলি সংখ্যাতেও বহু অপ্রকাশিত লেখকের লেখনী প্রকাশ করে আমরা বহু বইপোকাদের আনন্দ দিতে পেরেছি। স্বল্প কয়েক মাসের মধ্যেই যে এত মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমাদের ওপর বর্ষিত হবে, তাদর আমরা পাশে পাব প্রতিটি সংখ্যায় তা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল।

২০২০ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের স্বপ্নের জগৎ '***বই কুটির কলকাতা***' যখন পথ চলতে শুরু করেছিল তখন গুটিকয়েক লেখক বন্ধুদেরকেই সঙ্গে পেয়েছিলাম আমরা। যাদের গল্প, কবিতা, আঁকা অতি যত্নে সংরক্ষিত রয়েছে আমাদের শারদ সংখ্যায়। সময়ে সাথে তালমিলিয়ে একটু একটু করে বড় হয়েছে আমাদের পরিবার। আমরাও ধীরে, ভারে, ওজনে একটু হলেও বৃদ্ধি পেয়েছি আপনাদের ভালোবাসায়। যখন আমরা শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই, তখনও ভাবতে পারিনি যে লেখক বন্ধুদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সাড়া পাব। আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ '***বই কুটির কলকাতা***'র শারদ সংখ্যাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য। আশা করি একইভাবে দীপাবলি সংখ্যাকেও গ্রহণ করবেন আপনারা। লেখা পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানাই সকল লেখককে যারা আমাদের শারদীয়া সংখ্যা তো বটেই, দীপাবলি সংখ্যার জন্যও কলম ধরেছেন। আর যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই দীপাবলি সংখ্যা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছে, '***বুকক***' পরিবারের সেই সমস্ত সদস্যদের জন্যও রইল অফুরন্ত ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। আশা করি, সকল লেখক ও পাঠককে আমরা আনন্দ দিতে পেরেছি। আগামিদিনেও আপনাদের আশীর্বাদের হাত '***বই কুটির কলকাতা***'র সকল সদস্যের মাথায় থাকবে এই কামনা করি।

***

বই
কুটির
কলকাতার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শিশু শিল্পী

অঙ্কন দে

জসলীনা চক্রবর্তী

প্রিয়াংসী সাহা

অরণ্য দে

আরাত্রিকা মন্ডল

এবং

জুনালী বেজ (প্রচ্ছদ)

পৌলোমী নিয়োগী

বাপ্পা ভৌমিক

আরাধ্যা মজুমদার

ব্রতশ্রী দাস

গার্গী ঘোষ

গোপা দাস

পৃথা দে

রাহুল দে

সৈকত সাও

সঙ্গীতা দাস

সায়নী মন্ডল

শর্মিলা বিশ্বাস

সোমনাথ কর্মকার

ব কু ক

সূচীপত্র

কবিতা

একাকিত্ব
মৌটুসি

সংক্রমণ
সুনন্দ সান্যাল

ধূর্ত
দীপঙ্কর বিশ্বাস

বিনা অনুমতিতে
কণিকা সরকার

কুলিন
রণজিৎ মাইতি

ফিকে হলুদ
দীপঙ্কর বিশ্বাস

পরিযায়ী
বিকাশ কল্প

যদি আর না ভাঙে ঘুম!
মহঃ রহিম সেখ

অনুবাদ

শাশ্বত পরিচয়
শুভেন্দু বসু

বই কুটির কলকাতার

সূচীপত্র

ছোটো গল্প

বুদ্ধিমানের পরীক্ষা
মহঃ সামসুল হক্

মুখোমুখি
গোপা দাস

আলোয় ফেরা
পল্লবী সান্যাল

আন্তরিকতা
অন্তঃসলিলা

অনুভূতি

এক মুঠো প্রেম ছিল
নার্গিস সুলতানা
এবং
ব্রতশ্রী দাস

বই কুটির কলকাতার

সূচীপত্র

গল্প

অনুরাগ
মেরী খাতুন

কুম্ভকর্ণের বেলোর কীর্তি
দিব্যেন্দু ঘোষ

নিরুদ্দেশ
সৈয়দ হুমায়ুন রাণা

ভালো থেকো তুমিও প্রাক্তন
বিজয় রায়

শিকড়ের টানে
অজন্তা প্রবাহিতা

নিয়তি
বীনা সেনগুপ্ত

সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
অগ্নিমিতা দাস

Aadhar এ আঁধারিত
সুনন্দ সান্যাল

চিত্রশিল্পীঃ রত্নশ্রী দাস

একাকিত্ব

মৌটুসি

একাকিত্ব বেশ সোহাগের,

যখন প্রেম দূরে সরিয়ে রাখে |

একাকিত্ব প্রেমময় ভোরের শিশিরে..

যখন নিজেকে বাঁচাতে দরজা দিতে হয় না-

একাকিত্ব দৌড় করায়, নিজেকে প্রমাণ করতে।

মাথা রাখার জন্য ভালোবাসার কাঁধ যখন মরীচিকা, একাকিত্ব তখন সূর্যের প্রথম কিরণ।

একাকিত্ব শেখায় শেষ যাত্রায় হাত ধরে কেউ থাকবে না | থাকবে মহাকালের নিয়ম
একাকিত্ব।

কুলিন

রণজিৎ মাইতি

উঠোনের তুলসী গাছটি জন্ম কুলিন;
তিনশো টাকা কিলোর বাজারেও লঙ্কা চারাটি যতোটা অনাদরে বাড়ে ঠিক ততোটাই আদর-যত্নে বাড়ে তুলসি চারাটি!
কিছু কিছু সম্পর্কও তেমন;
যেমন স্বামী নামক সত্ত্বা,সে সগুন হোক কিংবা নির্গুন
পরম ব্রহ্মের মতো মিশে আছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
উদ্বেলিত রক্ত কণায়!
হায়, বিদূষী নারীও দেখি লঙ্কা চারাটির মতো বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে আরতীর অর্ঘ্য সাজায় !

বিনা অনুমতিতে

কণিকা সরকার

আনমনে ছিলাম বসে
কখন যে এঁকেছি ছবিটা
পাইনি তা টের!
হঠাৎ দেখি, মুখটা আমার বহু চেনা
নিঃসঙ্গ মূর্তি যেন
শক্ত চোয়াল, দু-চোখ তার আকাশে
গালে গড়িয়ে পড়েছে জল
কবে, কতদিন আগে,
নাকি রোজই দেখেছি তাকে
মনে নেই আজ
কোথায় ছিল, কোথায় থাকে,
তাও হয়নি জানা
শুধু জানি, সে এসেছিল
আমার জীবনের গভীরে
ছুঁয়েছিল মন অনায়াসে
ফুটপাতে, গলির মোড়ে, চলতি পথে
সর্বত্র দেখেছি তাকে।
রয়ে গেছে তার শত সুখস্মৃতি।
ছবিটা এঁকেছি ঠিকই, কিন্তু
অনুমতি নেওয়া হল না!

পরিযায়ী

বিকাশ কল্প

শহরে পরিযায়ী পাখীদের মত
আমরা শুধু ফিরে ফিরে আসি
শীত সমুদ্দুরে।
অথচ আমরা ক্রমশ হারিয়ে যাই।
পর্যায়ক্রমে নিজের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে
শহুরে কঙ্কাল ছুঁয়ে যাই।
যে উষ্ণতায় মানুষ স্বপ্ন বোনে
আমি তোমার সেই ওমে
নিজের অস্তিত্ব টের পাই।
পারদ ঘরে আগুন জ্বলে,
নিশ্বাস ছেঁকে আমি তোমার গভীরে
নিজেকে সাজাই।
বেঁচে থাকা কী অতোই সহজ?
তবু আমরা জীবন খুঁজি,
ঋতুর ভেতর বদ রক্ত হয়ে।
শরীর যাপন চুঁইয়ে
বিন্যস্ত সময়ে উড়তে উড়তে
ডানার আদর... ঋণ রেখে যাই।

ধূর্ত

দীপঙ্কর বিশ্বাস

আমাতে কলঙ্ক রটায় যদি
কখনও,একদম ডরিব না!
মরার আগে মরে গেছি কি?
মিথ্যে কথায় ঘাবড়াই না!
চোখ থাকতে যার দৃষ্টি নেই;
কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা।
মন থাকলেও আবেগ নেই;
শুধু পুতুলের দিনরাত কথা!
হাত পা জুড়ে অলস থাকে;
সকাল দুপুর সকল খানে।
এক হাত সমান চুল রেখে
সাজিয়ে নিয়েছে রূপটাকে!
আয় উপায়ের কমতি নেই
তাও বাসি খায় পেট পুরে।
নাকের লতিতে ফাঁকা নেই
সাজানো স্বর্ণ নোলক দিয়ে।
স্বামীরও বড় চাকরি আছে,
নিজেও পড়ায় হাই ইস্কুলে।
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী চুলোয় গেছে
তবেই বেহল্লাপনায় বাঁচে!
বেজায় খুশিতে গল্প জোড়ে;
বানিয়ে বলার নেইতো জুড়ি!
ভাজামাছ যেন জানে না খেতে!
পরগৃহ ভাঙে তার ছল-চাতুরী!

চিনে নেয় যদি আদি নামে
তাই তার এতো বেজায় ভয়!
আপনার কেউ থাকে না যাতে
দুদিনেই সে কাজ সেরে নেয়!
আগাছার জীবনে কি থাকে?
শুকিয়ে যায় মরশুম শেষে!
জীবন যাপনে যন্ত্রণা এলে
আমারাতো জুড়াই বন্ধুত্বে!

চিত্রশিল্পীঃ সোমনাথ বর্মকার

চিত্রশিল্পীঃ সৈকত সাণ্ডি

চিত্রশিল্পীঃ গোপা দাস

চিত্রশিল্পীঃ অঙ্কন দে

সংক্রমণ

সুনন্দ সান্যাল

ভেঙে যাওয়া কত
চঞ্চল কলমের শিস থেকে কালো
স্তব্ধতা আলোকে মুছে ফেলে..
অনন্ত দশক জুড়ে
সভ্যতার আনাগোনা সেই সুর ধরে..
কালো রঙ ছেয়ে আছে
সংক্রমিত টন্সিল।

শব্দচয়ন বাকী আছে ভবিষ্যতের কাছে
অবহেলার দায় নিতে শিখি না..
ঘষা কাঁচে অস্পষ্ট সুদূরের দৃশ্যতা
বিচলিত আগামীর ছন্দ মিলছে না।
যদি গত পাপের পরশে
নব্য কলম দিয়ে বিভেদ ফোটাও
ঘৃণ্য দোষে

অভিযুক্ত, ক্ষণস্থায়ী.. গল্পগুলোয়, পরাজয়ের স্বাদে..
অনুভূতি, উচ্ছ্বাস, প্রাণ ব্যতীত অবসাদে
মনুষ্যত্ব গুমড়ে কাঁদে।
বুনে চলে ওরা
প্রতিনিয়ত সাম্যবাদের স্বপ্ন
পুরাতনরা ভুল করে বলে..
ঘুণ ধরা চিন্তাভাবনা ভেঙে
অনিন্দ্য সুন্দর শব্দশৈলী হয়ে জাগো..
বিনিদ্র রাত অশরীরী অপেক্ষায়..
যুক্তির পথ বদলায় বলে।
চোখের নীচে জমা কালিগুলো লুকিয়ে
নব্য কলমে লেখা ভালো থাকার গল্প জমে উঠবে..
সময়ের লাঞ্ছনা রুখতে গণতন্ত্রের ব্যাপকতায় ধর্মনীতি,
রাজনীতি কবরে মিশবে।

ফিকে হলুদ

দীপঙ্কর বিশ্বাস

চলছে এক ভাবে ভয়ংকর শঙ্কিত রাজত্ব!
অথচ অবাধ বিচরণের মতো মুক্ত আকাশ!
বাতাস কখনো নিয়ে আসছে মিষ্টি মিষ্টি বার্তা;
ফুরসত কজনের আছে উপশম হবে বিষন্নতা?
জীবনের কথায় কথায় কত ঝংকৃত অহঙ্কার!
তবু স্বপ্ন আর বাস্তবের ফারাকই যেন ব্যাথার!
স্পর্শে মিষ্টি অনুভূতি,ভাবনায় নিমগ্নতা,আর ভয়!
সে আলগা হর্ষ,সুরের মাধুর্যতা আর কি ভাবায়?

স্নিগ্ধ ঘ্রাণ আসে সুমধুর সেও ফিকে স্মৃতি নিয়ে!
সে জীবন ছিল সমর্পিত হিয়ার দুরুদুরু স্পন্দনে!
মিইয়ে গেছে একটু সুখে দুরন্ত মুচমুচে কথারা,
কবিতার বিচরণের মতো মুক্ত নয় সে নেশা!
মিষ্টি স্পর্শের নিমগ্ন সুখে কোথায় বাউলের গান?
সঞ্চারিত আশায় রঙের খেলাও পুরনো বিধান।
এখন জটিলতা ভাল না লাগা কল্পনা,সব আছে,
তবে বঞ্চিত জীবনের মুক্তির ভাবনা কেন বিলাসিতা?

যদি আর না ভাঙে ঘুম!

মহঃ রহিম সেখ

যদি আর না ভাঙে ঘুম মৃত্যুর উপত্যকায়
সেদিন আর থেক না প্রিয়া আমার অপেক্ষায়
কবিতা আমার রবে বেঁচে প্রতিবাদী রক্তে
সত্বায়
বেঁচে রব অমর হয়ে কেঁদ না মৃত্যুর শয্যায়।

আমার যা ছিল তোমায় করেছি সমর্পণ
দুঃখ ভুলে গোলাপ প্রিয়া করিও অর্পণ।
সুন্দর পৃথিবী দিয়েছে আমায় ভুবন ভরা সুখ
সেই ভবনের আলোক শোভায় দেখছি তোমার মুখ।
কত সুন্দর নন্দিনী তুমি দিয়েছ ভালবাসা

নয়ন তারায় এঁকেছি ছবি দেখিছি আলো আশা।

যদি প্রিয়া জন্ম লভি ফিরব এই বাংলায়

ফুল হয়ে দেব সুগন্ধ ছড়াব ভালবাসায়।

ফুল নিতে আসবে জুঁই চামেলি গোলাপ

তখন প্রিয়া মিলেমিশে করব দুজন আলাপ

মৌলোভে আসবে অলি শুনাবে তারা গান

তুমি আমি মিলেমিশে হব এক প্রাণ।

ভালবাসা অমর বন্ধন ক্ষয় নাই তার

ভালোবাসো যদি প্রিয়া কবিতায় খুঁজো বারবার।

শিশুশিল্পীঃ অরণ্য দে

FEAR

KHALIL GIBRAN

It is said that before entering the sea
A river trembles with fear.
She looks back at the path she has traveled,
From the peaks of the mountains,
The long winding road crossing forests and villages
And in front of her,
She sees an ocean so vast,
That to enter
There seems nothing more than to disappear forever.
But there is no other way .
The River cannot go back .
Nobody can go back .
To go back is impossible in existence .
The River needs to take the risk
Of entering the ocean .
Because only then will fear disappear ,
Because that's where the River will know
It's not about disappearing into the ocean
But of becoming the Ocean .

শাশ্বত পরিচয়

শুভেন্দু বসু

মোহনায় এসে ক্ষণিক থামে নদী;
স্থূল কলেবর, মন্থর তার গতি ।
কল্লোলে নাহি কোনো কোলাহল --
অজানা শঙ্কায় যেন ভীরু তার চল ।
সমুখেতে বিস্তৃত অকুল পাথার,
সুবিশাল অম্বুরাশি অনন্ত অপার;
সহস্র উর্মি যেন উন্মত্ত আলিঙ্গনে
টানিছে তারে এক অমোঘ আকর্ষণে !
দুরু দুরু বক্ষে চক্ষু মুদে আসে ---
ফেলে আসা পথের স্মৃতি যেন মনে ভাসে ।
সেই শৈলশিখর হতে দ্রুত নেমে আসা,
উচ্ছ্বল আনন্দ-ছন্দের তালে তালে নাচা,
সঙ্গী সাথীর দল জুটিল কত নানা --
কেহ পরিচিত, কেহ বা নিছক অচেনা ।
কত-শত বাঁক, বাধা, বিজন কানন,
কত জনপদ, সুখ-হাসি, শোক- ক্রন্দন;
এমন- ই লক্ষ স্মৃতি নিয়ে দীর্ঘ পরিক্রমার
অন্ত আজ । নিয়তি চিরতরে যে থামার ।
আ-দিগন্ত ঐ পয়োধি জলে পাবে লয়
সযত্ন লালিত সকল বিশেষ পরিচয় ।
কিন্তু হায়, ফিরিবার পথ নাহি আর,
থাকিলেও সাধ সাধ্য নাহি ফিরে চলিবার ।
সমুখে চলা - ই যবে জগতের একমাত্র বিধি
অতল সিন্ধু মাঝে তাই ঝাঁপ দিল নদী ।
মুহূর্ত মাঝে দ্বন্দ্ব - ত্রাস সব হ'ল দূর;
ভ্রান্তি - ক্লান্তি অবসানে মন ভরপুর ।
শান্ত হৃদয় মাঝে জাগে দৃঢ় প্রত্যয় :
যে দাগ রহিল পথে --
সেই হোক তার সত্য পরিচয় ।
অসীমের বক্ষে স্থান নহে পরিচয় নাশ,
এ যে শাশ্বত পরিচয়ে নিত্য বসবাস ।।

(কবিতাটা নিয়ে আমি একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি । সেটা পাঠাচ্ছি । একে অনুবাদ কবিতা না অনুপ্রাণিত কবিতা, কি বলা উচিত সেটা জানিনা)

চিত্রশিল্পীঃ পৃথা দে

বুদ্ধিমানের পরীক্ষা

মহঃ সামসুল হক্

রাজা ঢোল শহরত করে সমস্ত প্রজাদের ডেকে পাঠালেন। প্রজারা জমায়েত হলে তিনি প্রজাদের উদ্দ্যেশে বলেন, ‘আমি যে ফল কোনও দিন খাইনি, সেই ফল যে এনে দিতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর আমার খাওয়া থাকলে, তাকে সেই ফল একবারে গিলে খেতে হবে। না পারলে হাজার চাবুক মারা হবে।’

সবাই হতভম্ব, রাজা আবার কোন ফল খায়নি? যা হয় হবে ভেবে কেউ ফল জোগাড় করার উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু তিন জন লোক তিনটি ফল জোগাড় করে ফেলে। আবার নির্দিষ্ট দিনে রাজার বাড়িতে সকল প্রজারা জমায়েত হয়। ফলওয়ালা তিন ব্যাক্তিকে রাজার স্টেজে ডেকে পাঠালেন।

প্রথম জন দেখালেন কাঁঠাল। রাজা রেগে আগুন। সিপাহী ডেকে বললেন, ‘এই ফল যেন সে একবারে গিলে খায়।’ কাঁঠাল কি আর গিলে খাওয়া যায়? মুখের উপর কাঁঠাল রেখে সিপাহী খুব ঠেলাঠেলি করল, কোনো মতে কাঁঠাল গেলানো যায় না। শেষে শর্ত অনুযায়ী সিপাহী চাবুক মারতে শুরু করল। পঞ্চাশ চাবুক মারতেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

ডাকা হয় দ্বিতীয় জনকে, সে এনেছে একটা বেল। রাজা বললেন, ‘এ ফল আমার খাওয়া আছে।’ সিপাহী ধরে নিয়ে গিয়ে বলে, ‘গিলে খা বেল।’ বেল কি আর গিলে খাওয়া যায়? সিপাহী বেল তার মুখে রেখে হাতুড়ি দিয়ে মারতে শুরু করে। বেল তো মুখের ভিতর যায় না উপরন্তু তার সমস্ত মুখের দাঁত গুলো ভেঙে যায়। তারপর শুরু হয় চাবুক। পঁচিশ চাবুক মারতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

দুই জন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে। তখন তৃতীয় জন মনের সুখে হাসছে। রাজা দেখে তৃতীয় জনকে জিজ্ঞেস করলেন হাসছ কেন? সে বলল, ‘বোকার কষ্ট এভাবে হয়।’

তারপর তৃতীয় জনকে ডাকা হল। তার কাছে ফল দেখতে চাওয়া হলো। সে দেখালো একটা "কুল"। রাজা বললেন, ‘এ ফল আমি খেয়েছি।’ সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী বললেন, ‘তোর ফল তুই গিলে খা।’ সাথে সাথে কুলটা মুখে রেখে গিলে ফেললো।

রাজা সকল প্রজাদের সামনে ঘোষণা করলেন - এই হল রাজ্যে সব থেকে চালাক ব্যক্তি। এই মুহূর্তে আমার রাজ্যে মন্ত্রী নেই, আজ থেকে এই হল আমার রাজ্যের মন্ত্রী।

***

চিত্রশিল্পীঃ বাপ্পা ভৌমিক

আলোয় ফেরা

পল্লবী সান্যাল

রায়বাড়িতে আজ আনন্দের শেষ নেই। বছর খানেক আগের কথা। দীপাবলির রাতে হারানো দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল টিয়া। বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্যা। রায় বাড়ির বড় ছেলে শমীক রায়ের একমাত্র মেয়ে।

টিয়ার দৃষ্টি হারানোর জন্য কিছুটা হলেও দায়ী ওর বাবাই। সেবার দুর্গা পুজোর সময় বাড়ি ভর্তি লোকজন। চারিদিকে হৈ চৈ। ঢাকের আওয়াজ, মন্ত্রপাঠ - এসবের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায় টিয়ার গলা ফাটানো আর্তনাদ।

বছর তিনেক আগের কথা। অষ্টমীর দিন। অঞ্জলীর তোরজোর চলছে। আঠারোর তন্বী টিয়া তখন নতুন শাড়ি নিয়ে তিনতলায় এ ঘর থেকে সে ঘর ছুটছে। মা – কাকিমা সবাই তো ব্যস্ত তাহলে শাড়িটা পরিয়ে দেবে কে? শেষ পর্যন্ত টিয়া যায় ঠাম্মির কাছে। ঠাম্মির ঘর দোতলায়। টিয়া সিঁড়ি দিয়ে নামছে। ঠিক সেই সময় তিনতলায় উঠছিল শমীক। কানে ফোন। কারও ওপর যে ভীষণ রেগে রয়েছে কথাবার্তায় তা স্পষ্ট। দরদরিয়ে ঘামছে। দু চোখ লাল। রাগ যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। বাবা মেয়ে দুজনেই ঊর্ধ্ব গতিতে ছুটছিল। কেউ কাউকে দেখেনি। তিনতলা থেকে নামার সময় বাবার সঙ্গে জোর ধাক্কা খায় টিয়া। তারপর বেসামাল হয়ে গড়িয়ে পরে সিঁড়ি দিয়ে। জখম হয় চোখ দুটো। সেই দুর্ঘটনাতেই দৃষ্টি হারায় টিয়া। তারপর দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলেছে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যদি কেউ চোখ দান করেন তবেই আবার দৃষ্টি ফিরে পাবে টিয়া। সেই কথা শুনে মেয়েকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দেখার আশায় বুক বাঁধেন রায় পরিবারের সদস্যরা। টিয়ার মা সোনালীদেবী মা কালীর কাছে মানত করেন। ঠাকুর ঘরে মা কালীর ছবির সামনে হাঁটুমুড়ে বসে মনে মনে বলেন, 'কালী পুজোয় যেমন চারিদিক আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে তেমনই আমার মেয়ের জীবনটাও আলোয় ভরিয়ে দাও মা।' ঠিক তার সপ্তাহখানেক বাদেই ছিল টিয়ার চেক আপ। ডাক্তারবাবু টিয়াকে দেখে বলেন, 'এমনিতে তো সবকিছু ঠিকই আছে, এখন অপেক্ষা শুধু একজন ডোনারের।' চিকিৎসকের পরামর্শ মতোই হাসপাতাল গুলিতে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিল শমীক। হঠাৎ একদিন এক হাসপাতাল থেকে এল সুখবর। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। টিয়ার মা তখন ঠাকুর ঘরে। শুনতে পেলেন, দুর্ঘটনায় মৃত এক যুবকের চোখ দুটো পেতে চলেছে টিয়া। মরনোত্তর অঙ্গদানের গুরুত্ব কতটা, তা আজ উপলব্ধি করতে পারে শিক্ষিত সমাজ। অনেকেই এগিয়ে আসছেন। নিজে বেঁচে না থাকলেও যে অঙ্গদানের মধ্য দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব সেকথা চিন্তা করেই মরণোত্তর অঙ্গ হিসেবে নিজের

চোখ দুটো দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নদীয়ার অন্তু দাস। বয়স পয়ত্রিশ এর আশেপাশে। বাইক অ্যাক্সিডেন্টে জখম হয়ে দীর্ঘদিন কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ওর চোখ দুটোই পায় টিয়া। সেই দিনটার কথা ভাবলে আজও বুকের ভেতর টা হু হু করে ওঠে রায়েদের। এদিকে মেয়ের দৃষ্টি হারানোর জন্য এখনও নিজেকেই দায়ী করে শমীক। ঘটনার পর থেকেই পাপ বোধে ভুগছে সে।

গত বছর দীপাবলিতে মেয়ের দৃষ্টি ফিরে আসার পর মানত অনুযায়ী এবছর উত্তর কলকাতার রায় বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছে কালী পুজোর। শুধু তাই নয়, পুজোর দিন তিনবেলা গরীব দুঃখীদের খাওয়ানোরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শমীক নিজে হাতে গরীব মানুষগুলোর পাতে খাবার পরিবেশন করে। তাদের কথা দেয় যথাযথ্য আপদে বিপদে পাশে থাকার। সে এও বলে নারায়ণ সেবার মাধ্যমেই আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। ছোট থেকেই টিয়া খুব দয়ালু। দীন দুঃখীদের জন্য সর্বদা ওর মন কাঁদে। তাই বাবার সিদ্ধান্তে খুবই আনন্দিত সে। বলে, ‘যে বড় মনের পরিচয় তুমি দিলে, তোমায় বাবা হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত।’

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই কাজে লেগে পড়েন রায় বাড়ির মহিলারা। কেউ ব্যস্ত মাটির প্রদীপে তেল ঢালতে তো কেউ বা ব্যস্ত বাজি সাজাতে। যেই অন্ধকার নেমে এল ওমনি ইলেকট্রিকের বাতির জায়গায় ঝলমলিয়ে উঠল মাটির প্রদীপের আলো। লণ্ঠনও ছিল। সেই পুরনো দিনের মতো। কচিকাচারা সব ছুটোছুটি করছে বাজি নিয়ে। টিয়াকেও অনেকবার ডেকে গেছে বাজি ফাটাতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু টিয়া তখন ভাই বোনদের সঙ্গে বাজি ফাটানোর আনন্দে না মেতে সোজা গিয়ে উপস্থিত হয় রেল লাইনের ধারে বসতিতে। সেখানকার বাচ্চাদের জন্য নিজের ভাগের দু ব্যাগ বাজি নিয়ে যায় সে। তাদের সঙ্গেই কাটায় কিছুক্ষণ। বাড়ি ফিরতেই যখন শমীক জিজ্ঞেস করে, ‘কই ছিলি এতক্ষণ?’ উত্তরে কোনো কিছু না লুকিয়ে সব সত্যি বলে দেয় টিয়া। শমীক তখন বলে, ‘এই না হলে আমার মেয়ে। চল বাজি ফাটাবি চল।’ সকলের সঙ্গে আলোর উৎসবে মেতে ওঠে টিয়া।

***

মুখোমুখি

গোপা দাস

ছোট্ট ছিমছাম শহর। শহর না বলে টাউনশিপ বলাই ভালো। বাড়ির সোকেশ যেমন পরিপাটি করে সাজানো থাকে ঠিক তেমনভাবে এই শহরটা সাজানো। টাউনশিপকে ঘিরে রয়েছে ছোট ছোট পাহাড়। ফলে এখানে দিনে গরম থাকলেও রাতে ভারী পোশাক পরতে হয়। দুধ-সাদা মেঘ আকাশে ভেসে যাওয়ার সময় পাহাড় গুলোকেও মাঝে মাঝে আলিঙ্গন করে যায়। আবার তাদের উপর অভিমান হলে মুখ ভার করে আছাড় খেয়ে বৃষ্টি হয়ে নেমেও আসে। মিশ কালো পিচের রাস্তা তখন আরও ঝকঝকে হয়ে দাঁত বের করে মুচকি হাসে।

একই অফিসে কাজ করায় সবার জীবনযাত্রার মান মোটামুটি এক। তবে প্রমোশন, গ্রেড এগুলো তো সব অফিসেই রয়েছে। তাতে উনিশ-বিশ ফারাক হলেও খুব একটা চোখে পড়ে না। সারি দিয়ে সাজানো কোয়াটার। প্রতি বাড়ি কম-বেশি সবুজে মোড়া। সব পাড়ায় রয়েছে ছোটদের জন্য পার্ক। সকালে বা দুপুরে পড়ার চাপে কচি-কাচার দল ভিড় না করলেও বিকেল হলেই সব হইহই করে ছুটে আসে।

তেল্লি আর মুনিয়া রোজ বিকেলে পার্কে খেলতে আসে। দু'জন একসঙ্গে খেলে। একই পাড়ায় থাকার সুবাদে তারা একে-অপরের ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে। দু'জনের বাবা আবার অফিসে একই ডিপার্টমেন্টে রয়েছে। তেল্লি মাদ্রাজি আর মুনিয়া হিন্দি ভাষী। ভাষা তাদের বন্ধুত্বে সেভাবে কখনো বাধা হয়ে ওঠেনি। দু'জনেই দু'জনের ভাষা টুকটাক শিখে নিয়েছে। ভাঙা ভাঙা শব্দে একে অপরের মনের ভাব দিব্য বুঝিয়ে দেয়।

তবে তেল্লি পড়াশোনায় যতটা মনোযোগী মুনিয়া ততটা নয়। মুনিয়ার এই অমনোযোগী হওয়ার পিছনে ওর বাড়ির একটা ভূমিকা রয়েছে। চার বোন আর মা-বাবা মিলে ছয় জনের সংসার। সবার বড়ো হওয়ায় সংসারের কিছুটা দায়িত্ব তাকেও নিতে হয়। মাকে কাজে সাহায্য করার পর মেলে পড়ার সুযোগ। তখন ঢুলুনি ছাড়া আর কিছুই মুনিয়ার ভালো লাগে না। আবার মাথা খাটিয়ে পড়তে ভীষণ বিরক্তি লাগে মুনিয়ার। অন্যদিকে, তেল্লিরবাড়ি একদম আলাদা। তাকে প্রায় কিছুই করতে হয় না।

নিয়মের জাঁতাকলে একদিন দু'জনের বন্ধুত্বে বিচ্ছেদে রেখা নেমে আসে। তেল্লির বাবার বদলি হয়ে যায়। সে চলে যায় অন্য শহরে। তবে তেল্লির চলে যাওয়ার দিন মুনিয়া খুব কাঁদে। তেল্লিকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদে। তেল্লিও কাঁদে। যোগাযোগ রাখার প্রতিশ্রুতি নেয় মুনিয়া। কেউ কাউকে কোনদিনও ভুলবে না এ কথাও তারা একে অপরকে দেয়। ছোট্ট দুই কিশোর মন নরম ফুলের মতো। ভবিষ্যত নিয়ে উদাসীন । জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজানা।

পনেরো- পনেরোটা বছর চোখের পলকে বেরিয়ে গেছে। জীবনের ব্যস্ততা পিছনে ফিরে দেখার সময় দেয়নি। তাই এইভাবে দেখা হতে পারে তারা কখনো ভাবতে পারেনি। সময়ের পলি তাদের স্মৃতিকেও মলিন করে দিয়েছে। তাই লছমি নামের কোন মেয়েকে প্রথমে চিনতে পারেনি তেল্লি বা আজকের আইনজীবী মধুরা। ব্যক্তিগত বিষয় ডিটেলে জানতে চাওয়ায় মধুরা জানতে পারে সামনে বসা মক্কেলটি আসলে তার ছোটবেলার খেলার সঙ্গী মুনিয়া। দুই বন্ধু মুখোমুখি। মাঝে কাঠের টেবিল আর পনেরো বছরের দূরত্ব। স্কুল গণ্ডি না পেরনো মুনিয়া বরের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে অজান্তে চলে এসেছে ছোটবেলার বন্ধু তেল্লির কাছে। টেবিলের ওপর প্রান্তে বসা বন্ধুটি আশ্বস্ত করতে চাইছে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মুনিয়া। সেই দৃষ্টিতে বেদনার পাশাপাশি আছে এক অসহায়তা।

***

চিত্রশিল্পীঃ গার্গী ঘোষ

আন্তরিকতা

অন্তঃসলিলা

গতবছর সেই গ্রাম থেকে বহু কষ্ট করে ছুটে এসেছিলাম তোমার সাথে মা দুর্গার কাছে অঞ্জলি দেবো বলে। কিন্তু তোমার অপমান হবে বলে তোমার পাশের বাড়িতে আমার অচেনা এক ব্যক্তির বাড়িতে অঞ্জলি দিলাম আর তুমি তোমার পাড়ার মণ্ডপে। এতো কাছে গিয়ে ও সকলের সামনে তোমার সাথে অঞ্জলি দিতে পারিনি।

এবছরও আবার গ্রাম থেকে ছুটে এলাম, কিন্তু এবছর চোরের মতো কত ছল চাতুরী করে কয়েক সেকেন্ড মাকে দেখেই হীরে চুরি করে কেটে পড়ার মতো টুক করে কেটে পড়লাম। প্রসাদটাও তুমি চুপিচুপি নিয়ে এলে আমার জন্য। অনেক দূরে বসে আমাকে খাইয়ে দিলে নিজের হাতে।

আমাকে এতো ভালোবাসো কেন? তোমার তরফে তো কেউ আমাকে পছন্দ করে না, আমি গ্রামে থাকি, আমার বাবা গরীব, আমি কালো রোগা পাতলা চেহারা।

তোমার অনেক বন্ধুরাও আমাকে ছেড়ে দিতে সদুপদেশ দিয়েছেন।

তোমার অনেক আত্মীয় স্বজনেরা মুখ বাঁকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলেছেন, মেয়েটার বাপের ভালো টাকা পয়সা থাকলে সুবিধা হতো, কিসসু নেই! পারলে ছেড়ে দে। তোমার বাড়িতে ও আমাকে নিয়ে অনেকেই অসন্তুষ্ট, বিরক্তি প্রকাশ করে।

আমাদের নাকি গ্রহ নক্ষত্রেরও অনেক দোষ আছে।

এতো প্রতিকুলতা সত্ত্বেও কেন ভালোবাসো আমায়? তোমার সাথে পথ চলতে ও আমার খারাপ লাগে, তুমি অপূর্ব সুন্দর। রাজপুত্রের মতো দেখতে । আমি তো কোন শ্যাওড়া গাছের প্রেত্নী, শাঁকচুন্নি।

লোকের কথায়, সমালোচনায় খুব কষ্ট পাই, কিন্তু আমি আজ ভীষণ খুশি সবার সমালোচনার আড়ালে আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ভরিয়ে দিয়েছো তুমি। নিজের হাতে গালে তুলে প্রসাদ খাইয়েছো।

অপেক্ষায় রইলাম কবে তুমি ভয় কাটিয়ে সকলের চোখের সামনে থেকে হাত ধরে তোমার পাড়ার পূজা মণ্ডপে নিয়ে যাবে! অপেক্ষায় আছি কবে তুমি বলবে এসো আমার পাশে থেকে আমার সাথে অঞ্জলি দেবে। অপেক্ষায় আছি কবে তুমি সেই সব সমালোচকদের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে " আমি তোমাকে ভালোবাসি।" তাদের সামনে বলতে পারবে আমি তোমাকেই ভালোবাসি। তুমি কালো বলে আরও বেশি করে ভালোবাসি তোমায়। কারণ কিছু কিছু ফর্সা সুন্দর মানুষের মনে একটা সৌন্দর্যের অহংকার আছে। যেটা আমাদের নেই।

আমি কিন্তু প্রাণাধিক ভালোবাসি তোমাকে। খুব শ্রদ্ধা করি তোমায়। তোমার মতো এতো সুন্দর মানুষের বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। কুটিলতা নেই, ছলনা নেই, হিংসা নেই,,,,,

এমন সারল্য পূর্ণ মানুষ তো তপস্যা করেও প্রাপ্ত করা যায় না গো। আশীর্বাদ করো যেন তোমার শ্রী চরণে ঠাঁই পাই প্রভু।

***

এক মুঠো প্রেম ছিল

নার্গিস সুলতানা

রোশনির কাল থেকে ভীষণ মন খারাপ। রোহিতের সঙ্গে রোশনির সদ্য ব্রেক আপ হয়েছে। খাওয়া দাওয়া একপ্রকার বন্ধ, মাঝে মধ্যেই রোশনির চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। এই নিয়ে তিন তিনবার মন ভাঙল ওর। এবার ঠিক করল, জীবনে আর কখনও প্রেম নয়।

রাতে ঘুম আসছিল না, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল রোশনি। স্বপ্নে দেখল কেউ যেন তাকে বলছে - ভাবিস না এবার থেকে তুই যেমন মনে মনে চেয়েছিলি, সো কলড ভালবাসা হলে প্রতিদিন, আমি ব্রেকআপ গুলোকে করে দেব যন্ত্রণাহীন...

***

পৃথিবী কখনই থেমে থাকতে পারে না। পৃথিবী সর্বদা ঘূর্ণায়মান। কখনও যদি পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যায়, আমরাও হারিয়ে যাব মহাশূন্যে।

ঠিক সেভাবেই আমাদের জীবন সর্বদা ব্যস্ত ও চলনশীল - কখনও কোথাও থেমে থাকতে পারে না, কিন্তু এই শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা তাদেরকেই স্মরণ করি বা সাড়া দিয়ে থাকি, যারা তাদের নিজস্ব কৌশলে আমাদের হৃদয়ে নিজের স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

---ব্রতশ্রী দাস

তাই নিছক ব্যস্ততা বলে কিছুই হয় না। আমরা সকলেই ব্যস্ত, এটা আমাদের জন্মগত।।

আমাদের জীবনবৃত্তে এমন কিছু মানুষর সাথে পরিচয় ঘটে যাদের সাথে হয়তো সম্মুখে সাক্ষাৎ ঘটেনি, কিন্তু একটা অদৃশ্য অন্তরের মিল তাদের সাথে হয়ে থাকে। মনে হয় যেন তারা বহু দিনের চেনা। অথচ সামনের চেনা মানুষেরা কখন যে অচেনা হয়ে পড়ে। আসল বাহ্যিক দিকটা কিছুই নয় মনের মানসিকতার মিলনই চিরতরে স্মৃতিতে থেকে যায়।"

---ব্রতশ্রী দাস

চিত্রশিল্পীঃ রাহুল দে

অনুরাগ

মেরী খাতুন

মেঘনা একটু রাত করে খায়। খেয়ে উঠে মেয়ের পড়ায় মুড থাকে না বলে ডাইনিং টেবিলে শুধু মা আর মেয়ে। এইসময় টা একান্তই তাদের। সেদিনও সেরকম চলছিল। হঠাৎ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, "কিরে মুড পাংচার কেন?"

কোচিংয়ে আজ নীলকে চড় মেরেছি

সে কি! কেন? হতভম্ব মেঘনা তাকিয়ে রইল।

ও কী মনে করে? ক্লাসে বাজে কথা বলবে আর আমি সহ্য করব?

স্যার ছিলেন না?

স্যার ম্যানেজ করতে না পারলে কী করব, একজনকে তো দায়িত্বটা নিতে হবে। আমি তো আর দুর্ভিক্ষের ফ্যান চাওয়া মানুষের মতো সেই দিকে তাকিয়ে...। মাঝখানে বাক্য আটকে গেল। কারণ তার চোখ পড়েছে বাটির দিকে।

রাধামাসি! মাছের কি জন্ডিস হয়েছে?

এতো রাতে চেঁচাচ্ছ কেন? ধমকে ওঠে রাধা। হলুদ কম ছিল বলে ওরকম দেখাচ্ছে। খেয়ে দেখ, ভাল হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই সে নেহাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়াতে অভ্যস্ত।

মেঘনাকে বিচলিত মনে হল। ঝামেলা করা তোর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে না?

নেহা আরও রেগে। কি ঝামেলা করি?

এই মস্তানির কী পরিণতি হতে পারে জানিস? মেঘনা শুধু এইটুকু মুখ ফুটে বলল। তার বলার ছিল অনেক কিছু।

নেহা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের দুঃখিত দৃষ্টিতে মনে হল, মাকে বুঝতে পারল। এরপরই মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলে উঠল, ওহ মা! সব ব্যাপারে তুমি এত সিরিয়াস কেন? আরে, জীবনের খেলার নিয়মকানুন অন্যরকম।

খাওয়া শেষে থমধরা মুখে উঠে দাঁড়াল মেঘনা।

নেহা হাতটা টেনে ধরল। আচ্ছা মা, যতটুকু অবসর তোমার---আমাকে নিয়ে শুধু টেনশন প্র্যাকটিস ছাড়া আর কিছু করার নেই তোমার? এই জন্যই বলি, বিয়ে না হয় করোনি, একজন ক্লোজ পুরুষ বন্ধুও তো তোমার থাকতে পারত? অন্তত মন উজাড় করে সবকিছু শেয়ার তো করতে পারতে? আর আমিও একটু রেহাই পেতাম। একটু থেমে আবার বলল, আমি জানি, অন্য পুরুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক দেখলে পাছে আমি দুঃখ পাই, এই ভেবে নিজেকে বঞ্চিত করেছ। হ্যাঁ, অল্প বয়সে সেরকম দেখলে পেতামও হয়তো। কিন্তু এখন আমি সত্যি চাই মা! সমীর আঙ্কেল তোমার তো ভীষণ ক্লোজ বন্ধু, ওকে না হয়---আবেগভাবে কথাটা শেষ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু ইতস্তত হয়ে, কী আজে বাজে বকছিস? জানিস তুই কী বলছিস! সমীর আমার থেকে দশ-এগারো বছরের ছোট। আর তুই নাকি তার সঙ্গে আমাকে? ছিঃছিঃ!

কেন মা? কে বলছে তোমায়? বয়সে ছোট হলে সম্পর্ক তৈরি হয় না? আলবাত হয় মা! ভালোবাসার কাছে ছোট--বড়, কোন ম্যাটার না, মা ।

আমি ঠিক সমীর আঙ্কেলকে মানিয়ে নেব। তোমাদের দুজনকে এক করেই ছাড়ব। মনে মনে বিড়বিড় করে নেহা।

ইলেভেনে পড়া মেয়েদের প্রগলভতায় মেঘনা এখন অনেকটা অভ্যস্ত। মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুদের ক্লোজডোর সিক্রেট, টিচারদের নিয়েগসিপ--বাদ যায় না কিছুই। মতান্তর, রাগ, অভিমান এবং শেষ পর্যন্ত গলা জড়াজড়ি সবই চলে, কিন্তু তাই বলে নিজেকে নিয়ে...তাছাড়া জীবন প্রবঞ্চনা করলে, জীবনের কাছে কী দাবি থাকে মানুষের? বোধহয় সেই আবেগটা ঢাকতেই একটু হাসার চেষ্টা করল। একটা হাত মেয়ের মাথায় রেখে বলল, "তোর বড় হওয়া দেখতে দেখতেই তো এতগুলো বছর পার করে দিলাম। এখন আর কি?" সত্যিই বোধহয় মেয়েটা বড় হয়েছে এবার।

মালদার শোভানগর গ্রামের মেয়ে মেঘনা। সেনাবাহিনীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মেঘনার বাবা গ্রামেরই এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী কৃশানুর সাথে বিয়ে দেন। স্বামী ছিল সুরাসক্ত। কতটুকুই বা ছিল নেহা। বছর তিনেক! তখন আত্মঘাতী হন কৃশানু। বাড়ি ভর্তি সেদিন মানুষের ভাষাহীন, বিভ্রান্ত মুখ, কান্নার শোরগোলে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। শববাহী যানের মধ্যে সাদা কাপড়ে ঢাকা বাবার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে, কাকে একবার জিজ্ঞেস করছিল, 'বাবা ওখানে কেন?' কী বুঝেছিল কি জানি! একসময় যখন শববাহী যানটা সবে রওনা দিল। দোতলার বারান্দা থেকে সে চিৎকার করে উঠল, বাবা চলে যাচ্ছে কেন? বাবা...আমি তোমার সঙ্গে যাব....। বাবা....বাবা! ওর গগনভেদী চিৎকার স্তব্ধ শবযাত্রার দৃষ্টি তখন বারান্দার দিকে। রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়তে চাইছে নেহা। সেই কান্নার আকুলি বিকুলিতে প্রতিটা চোখের জলে গভীর হাহাকারের সৃষ্টি হল।

আর মেঘনার তখন তো চোখ জুড়ে ছিল শুধুই অপরিসীম শূন্যতা। জমি, জায়গা বিক্রি করে একটা ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে মালদা শহরে মেয়ে আর রাধামাসিকে নিয়ে চলে এল। এই পরিস্থিতিতে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরার কী-ই-বা ছিল সামনে? যেদিন ব্যাঙ্কের চাকরিটা পেল, অনেক অন্ধকার পেরিয়ে রাত ভোর হল যেন তার ঘরে।

টিফিনে মেয়েকে ফোন করল মেঘনা। সুইচ অফ। রাধামাসির কাছে জানল, মেয়েবাড়ি নেই। এ তো মহা মুশকিল! না বলে কোথায় গেল? আফিসে আসার আগে ও গজগজ করছিল। পরীক্ষা সামনে। আর এখন দেখ বাড়িতেই নেই। শুধু ফাঁকি দিয়ে-দিয়ে নিজের ভবিষ্যতটা ভুষো কালি করবি? তাতেও কী কোন ভ্রুক্ষেপ আছে?

যতই বড় হয়ে উঠতে থাকে ততই যেন বিগড়ে যাচ্ছে।

শুধু ওর জন্যই তো? যেভাবে বেঁচে আছে, এর সঙ্গে বেঁচে না থাকার কোনও পার্থক্য আছে?

মাঝে মাঝে মনে হয়, সে তার মেয়েটির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এইজন্যেই কি মেয়েকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে? কী করবে? তার অবস্থা তো সরু দড়ির ওপর দিয়ে চলার মতোই। বাবার মতো কঠিন হয়ে শাসন করতে গেলে, মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে আবার তাকেই দুঃখ ভুলিয়ে দিতে হয়। সুতরাং শাসনটা আর কাজে লাগে না।

"ম্যাডাম শরীর খারাপ?" চমকে ওঠে মেঘনা। দেখে প্রবীরদা। কী বলবে বুঝতে না পেরে ভাঙা দেওয়ালের মতো চোখে তাকাল।

প্রবীরদা বললেন, জমা খরচের হিসেবটা আজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবেন।

প্রবীরদার যান্ত্রিক গলা মেঘনার মনে কোনও দাগ কাটল না। শুধু মনে হতে লাগল, মেয়েটা কি সত্যিই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল? কত স্বপ্ন ছিল এই মেয়েকে ঘিরে। কিন্তু কি করবে সে? অনন্ত ধাঁধার মধ্যে পড়ে। ভাবে সমীরের সঙ্গে কথা বলবে। ঠান্ডামাথায় সহজ কথায় সে বহুবার তাকে উদ্ধার করেছে। দশ বছরের ছোট হলেও সমীর তাকে প্রথম থেকেই বিভিন্নভাবে মোটিভেট করত। তাই হয়তো অফিসের শুরুতেই বন্ধুত্বটা গড়ে উঠেছিল। নেহার প্রতি ওর স্নেহ বন্ধুত্বকে আরও গাঢ় করে তুলেছিল। ছোট থেকেই তার সব আবদার আঙ্কেলের কাছে। বেড়াতে যাওয়া, কিছু শেয়ার করা-----রিং করতেই ওপাশ থেকে সমীর বলল," কী খবর?"

ব্যস্ত তুমি?

--- না ছুটিতে আছি। দু'দিন ধরে জ্বর।

--- তাই? বলোনি তো?

বললে তুমি দেখতে আসতে? হা-হা করে হাসে সমীর।

তারপর বলে আরে না না, বলো।

নেহার কথা ছাড়া আর কী বলব....।

ওহ, মেঘনা! এমন করছ যেন ও এখনও সেই ছোট বাচ্চা। মেয়ে বড় হয়েছে, এবার তোমার পুরনো বিচারভঙ্গিটা একটু পাল্টাও তো! ও কিন্তু অনেক বুঝদার মেয়ে?

মেঘনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফোনটা কেটে গেল। সুইচ অফ! কেন? এটা ভাবতে কিছুক্ষণ সময় নিল। এরপর মনটাকে বেঁধে চেক ভাউচার, ডিপোজিট স্লিপগুলো কম্পিউটারে ঠিকঠাক এন্ট্রি হল কিনা তাতে মন দিল। কিন্তু নীলের কথা মনে পড়তেই ভিতরের দম হারানো ঘোড়াটা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল। অতগুলো ছেলেমেয়ের সামনে সেদিন নেহা ওকে....যদি প্রতিশোধ নেয়? বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে....কতই তো আজকাল হচ্ছে এরকম। বুকের মধ্যে তীব্র ছটফটানি। বারবার রিং করে দেখছে আর সন্তানের জন্য প্রাণপণ প্রার্থনা করছে। নাহ, এখনই এই মুহূর্তে তাকে বের হতে হবে। ভাবনার গোলক ধাঁধায় দিশেহারা হয়ে যখন রাস্তায় বের হল, আকাশটা তখন একেবারে কালো হয়ে আছে। একটা ভারি দমকা হাওয়া রাস্তার দু'ধারে পড়ে থাকা পলিথিনের ফিনফিনে ব্যাগ, কাগজের টুকরো, পান মশলার মোড়ক ধুলোর ঘূর্ণিতে পাক খাওয়াচ্ছে। আজকে এখনই কাল বৈশাখীটা হওয়ার ছিল? মাত্র দু'মিনিট আগে ঘড়ি দেখেছিল সে। ছটফট করে আবার সময় দেখল। দমকা হাওয়াটা উপেক্ষা করে হনহন করে হাঁটতে লাগল। একটা ফাঁকা রিকশা আসছিল। হাত নাড়িয়ে রিকশার কাছে চলে এল। মুখ থেকে ফট করে বেরিয়ে গেল, "গৌড় রোড"।

রিকশা থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর লিফটে উঠল। বি-ফোর, এ দরজা খুলতেই দু'টো বিস্ফোরিত চোখ চেয়ে রইল।

"আরে, তুমি!" কৃতজ্ঞ হৃদয়ে হেসে উঠল সমীর। এসো, এসো, আমার তো চিমটি কেটে দেখতে ইচ্ছে করছে। যা দেখছি, সত্যিই ঘটছে তো? না...।

মেঘনা ঝেঁঝে উঠল, ফোনটা বন্ধ রাখার মানে কি?

মেয়ের উপর রাগটা যেন সমীরের উপর উগড়ে দিল।

ওহ, বন্ধ হয়ে আছে, তাই তো! সরি, মেঘনা....। তার বলার ভঙ্গিমাতে অপরাধ স্বীকার আর কৌতুক মিলেমিশে আছে। কিন্তু তার ক্ষমা প্রার্থনা যেন গ্রাহ্যই করল না মেঘনা। কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল। দেখল নেহা। হুড়মুড়িয়ে ফোন ধরল।

"কোথায় তুই?"

"তোমার স্বামীর বাড়িতে।"

সব সময় ফাজলামো! কোথায় গিয়েছিলি? না বলে বেরিয়ে যাবি, আবার মোবাইলও বন্ধ রাখবি। ইয়ার্কি পেয়েছিস?

স-রি, মা। মোবাইলে চার্জ ছিল না।

পে-ফোন ছিল না? এমন গবেটের মতো কাজ করিস, ভাবতে অবাক লাগে।

আচ্ছা, তার জন্য না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিও।

আসছি। বলেই সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল মেঘনা।

সমীর এতক্ষন নির্বাক চেয়েছিল। এবার সে চেঁচিয়ে উঠল।

আরে কেমন মানুষ তুমি? মেয়ের ফোন পেলে আর অমনি উঠে দাঁড়াল? প্লেগ আক্রান্ত রোগীর মতো আমাকে ত্যাগ করে?

এসে যখন পড়েছ, একবার আমার জ্বরের খোঁজ তো নাও!

কী করে বাঁধালে?

আগে বলো চা না কফি?

আমি কি আতিথ্য রক্ষা করতে এসেছি?

না, প্রথম এলে তাই। অফিস থেকে ফিরেছ, খিদে তো পেয়েছেই---তা না হলে সাধ করে কে আর অপদস্থ হতে চাই বলো?

খিদে নেই আমার।

ও...বেশ কয়েক সেকেন্ড কাটল। তারপর ইতস্তত গলায় সমীর বলল, একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না তো?

মেঘনা তাকাল, কী?

একটু হেলান দিয়ে শোবো?

এতে মনে করার কি আছে?

পিলোগুলো একত্র করে ডিভাইনে আধশোয়া হল সমীর।

মেঘনা বলল, তোমার এরকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?

কিছু না।

মেঘনা উঠে পড়ল। তারপর কি মনে করে কাছে এসে দাঁড়াল। জ্বর আছে? হাতটা কপালে রেখে মেঘনা আঁতকে উঠল। জ্বর আছে তো! ওষুধ খেয়েছ? মেঘনা রান্নাঘর থেকে ঠান্ডা জল নিয়ে এসে কপালে জলপটি দিতে লাগল। সমীর চোখ বন্ধ করে আছে। কিছুক্ষন জলপট্টি দেওয়ার পর মেঘনা বলল, আসছি আমি।

খপ করে তার হাতটা টেনে ধরল সমীর। তারপর অনেক কিছু বোঝানো যায়, এমন দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল। খানিকক্ষণ নীরব কাটাল। মেঘনা সমীরের মুঠো করা হাতের মধ্যে থাকা ওর হাতটার দিকে তাকাল একবার। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের দুর্বলতার গতি প্রতিরোধ করে আলতো করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

কিছুক্ষণ মেঘনার চোখের দিকে তাকাল সমির। তারপর আকুল স্বরে জানতে চাইল, কেন, আমাকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করার সাহস তোমার নেই?

মেঘনা মাথা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। জলভরা চোখে মুখ তুলল। খুব ধীরে মাথা নেড়ে রুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করল, "না নানা।"

তার না উত্তর সমীরকে বিচলিত করলেও পরাভূত করতে পারল না। সঙ্গে-সঙ্গে সমীর বলল, মানুষ তো বিয়ে করে একসঙ্গে সুখে শান্তিতে সারাজীবন কাটানোর জন্য। কিন্তু সেই মানুষটাই তো তোমার সঙ্গে নেই। ঢেউ সামলে সামলেই তো এখনও চলতে হচ্ছে। তারপর খুব দৃঢ় স্বরে বলে, নেহা-ই হবে আমাদের একমাত্র সন্তান।

কক্ষনও না! আমি তোমার বন্ধুত্ব চেয়েছি মাত্র।

বুঝেছি, আমার সম্পর্কে আদৌ কোনও অনুভূতি নেই তোমার।

তখনই কোনও জবাব দিতে পারল না মেঘনা। পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে আছে সমীর। কী বলবে ভাবতে কয়েক সেকেন্ড লাগল মেঘনার। বলল, অনুভূতি আছে কিনা জানি না। তবে ভাললাগাকে অস্বীকার করছি না। বলেই দরজার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল।

দাঁড়াও...।

মেঘনা ফিরল।

মোবাইলটা হাতে দিয়ে বলল, পড়ো এস এম এস-টা।

মোবাইলের দিকে তাকিয়ে মেঘনার চোখ বিস্ফোরিত। "নেহা পাঠিয়েছে তোমাকে?"

বাইরে দূরের গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে অস্তমান সূর্য থেকে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে। হাউজিংয়ের বাগানে সন্ধ্যার আকাশ প্রতিফলিত হয়েছে। সমীর জানলা দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার ফোনটা নেহা-ই কেটে দিয়েছিল।

মানে! ও এখানে এসেছিল, তোমার কাছে?

হ্যাঁ প্রায়ই নেহা এখানে আসে আর ঐ একই কথা বলে। আজও .....।

মেঘনা বিস্ময়ভরা চোখে একবার মোবাইল আর একবার সমীরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর হড়বড়িয়ে পড়তে লাগল। একবার নয়, দু'বার। তিনবার। "আঙ্কেল, গো অ্যাহেড। টেল মাম, ইয়োর ট্রু-লাভ।" বাবার ভুলে যাওয়া স্মৃতির চেয়ে তোমার জীবন্ত সহচর্য কি অনেক দামী নয়?

পড়তে-পড়তে মেঘনার চোখের জল পড়ছে মোবাইলের ওপর। সমীর বুক ভরা বেদনার বোঝা নিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, তুমি এখন যেতে পারো। হাত থেকে মোবাইলটা নিতে সমীরের সামান্য স্পর্শেই কী যে যাদু! প্রাণপণ চেষ্টাতেও নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। কান্না আরও বাড়ল। আচমকা সমীরের ওপর টলে পড়ল। টাল সামলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে। অনেকক্ষণ।

তারপর ধীরে-ধীরে তুলে ধরল মুখটা। ভেজা গালে লেপ্টে আছে চুল। কান্নার দমক তখনও ফুলে-ফুলে উঠছে তার শরীরে। সমীর ভাঙা-ভাঙা গলায় কোনও রকমে বলতে চেষ্টা করল, "তোমার এই কান্নার নাম কি শুধু ভালোলাগা, ভালোবাসা নয়?"

তাতে মেঘনা আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল। শরীরের মধ্যে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে গেল ওই শব্দগুলো। মনে হল, প্রবল বৃষ্টিতে তার শরীর গলে যাচ্ছে সমীরের শরীরের ভিতরে।

***

শিশুশিল্পী: প্রিয়াংসী সাহা

নিরুদ্দেশ

সৈয়দ হুমায়ুন রাণা

একটি রিকশা গৌরাঙ্গ রায়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একজন হাফ পেন্টুল পরা ভদ্রলোক রিকশা থেকে নামলেন। তাঁর কাঁধে বিশাল একটি ব্যাগ ঝুলছে, হাতে ধরা আছে সুটকেস। মাথায় গোল ঢালি টুপি। মুখে একগাল চাপ দাড়ি। অযত্নের জন্য লাল মরচে ধরেছে যেন। তিনি একটি একশো টাকার নোট রিকশাওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, দ্রুত বাড়িতে প্রবেশ করলেন। রিকশাওয়ালা অবাক নেত্রে, বাবুটির দিকে চেয়ে থাকল এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি গামছা দিয়ে শরীরের ঘাম মুছতে লাগলো।

সুলক্ষ্মী বারান্দার এককোণে মশলা বাটছিলেন। ভদ্রলোক কাউকে কিছু না বলে সটান তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতেই সুলক্ষ্মী ভয় পেয়ে এমন চিৎকার করে উঠলেন যে, পালে বাঘ পড়েছে। বাড়ির লোকজন সব ছুটে এল তাঁর চিৎকারে। ভদ্রলোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখে তার রা নেই। গৌরাঙ্গবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে? আপনার অভিপ্রায় কী?' রাগচটা গৌরাঙ্গবাবু একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ভদ্রলোককে বিপাকে ফেলে দিলেন। তিনি একসময় যাত্রা করতেন। কথাও বলেন যাত্রার ঢঙে। ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি এই বাড়ির বড় ছেলে অমলেন্দু রায়। তুমি আমার ভাই গৌরাঙ্গ বুঝি? '

- হ্যাঁ, আমি গৌরাঙ্গ। কিন্তু তুমি এ্যাদ্দিনবাদে কোত্থেকে এলে? মা বাবাকেও তোমার মনে পড়েনি একবারও?'

- বলছি ভাই বলছি, আগে আমাকে একটু বসতে দাও - সব বলছি।' অমলেন্দুবাবু অনুরোধের সুরে কথাটি বললেন। সুলক্ষ্মী দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে তাঁর সামনে রনং দেহি মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গৌরাঙ্গবাবু আদেশ দিলেন, এই একটা চেয়ার এনে দে তোদের জেঠুকে। ছেলেটি ঘরের দিকে প্রস্থান করল। মেয়েটি দুটি অমলেন্দুবাবুর পদ স্পর্শ করে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। তিনি মেয়েদের আশীর্বাদ করে বললেন, 'বেঁচে থাকো মা - দীর্ঘজীবী হও।' সুলক্ষ্মী রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। এক কাপ চা ধরিয়ে না দিলে, স্বামীর চোখে অপরাধী হতে হবে - সেই জ্ঞানটুকু ইতিমধ্যে তাঁর ভালরকম জানা আছে। এই নিয়ে সংসারে কম অশান্তি হয়নি।

অমলেন্দুবাবু উঠোনে উঠে এলেন। তনয় একটি চেয়ার এনে দিল। তিনি আরাম করে বসলেন। বড় মেয়ে টিনা এক গ্লাস জল এনে জেঠুকে খেতে দিলেন। লক্ষ্মী কাপ-প্লেট সাজিয়ে কিছু স্ন্যাক্স সহযোগে চা পরিবেশন করলেন। অমলেন্দুবাবুর মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল কয়েক মুহূর্তে। গৌরাঙ্গবাবু দাদার পদতলে ধপাস করে বসে পড়লেন। তাঁর মনে দাদার কাহিনী শোনার কৌতূহল জাগছিল।

অমলেন্দুবাবু চা – জল খেয়ে খানিকটা স্বস্তি পেলেন। তিনি তাঁর জীবন কাহিনী শুরু করলেন – 'আমি বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়েছিলাম। তুমি তখন দশ/বারো বছরের হবে। তোমার আমাকে মনে পড়ে কিনা জানি না। কিন্তু তুমি একদিন আমার খুব ন্যাওটা ছিলে গৌরাঙ্গ।'

- 'কিছু কিছু কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে দাদা। তোমার সেই মুখের আদল একদম বদলে গেছে। তোমাকে চিনতে পারব কি করে বলো?'

- 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে একটি বড় হোটেলে বয়ের কাজ নিই। সেই হোটেলে একজন সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি আমার ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছিলেন। ভদ্রলোক বাঙালি। তাঁর নাম সৌমেন মুখার্জি। সৌমেনবাবু একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। আমাকে তিনি একটি জাহাজে চাকরি করিয়ে দিলেন। বিদেশী মালবাহী জাহাজে। আমার জাহাজ কলকাতা বন্দরে খুব কম আসতো। মুম্বাই বন্দরে বছর দু বছর অন্তর একবার করে আসতো। বাড়ির কথাও তখন ভুলতে বসেছিলাম একরকম। কাজে ব্যস্ত থাকতাম। ছুটি ছাটাও কম ছিল। একবার বাড়িতে চিঠি লিখেছিলাম দেশে থাকতে। উত্তর পাইনি।'

- 'তুমি চিঠি লিখেছিলে এমন কথা কোনওদিন শুনিনি তো।'

- 'তুমি বিশ্বাস করো ভাই আমি বাবাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। সেটি আমার কাছে মুম্বাইয়ের বাসায় ফিরে আসে। আমি সেই থেকে, বাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা করিনি। মনে প্রচন্ড অভিমান, দুঃখের পাহাড় জমে উঠেছিল। তারপর একদিন নিউইয়র্কে গেলাম। নিউইয়র্কের বিখ্যাত বন্দর নরওয়েগন ছেড়ে আমাদের জাহাজটি নোঙরে ছিল। দিন চারেক হাতে সময় ছিল। আমি শহরটাকে ঘুরে দেখতে এবং কিছু কেনাকাটা করতে বের হলাম।

- 'তারপর? গৌরাঙ্গবাবু আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল। সুলক্ষ্মীর ছেলেমেয়েরাও কখন এসে জুটেছে। ওদেরও প্রবল আগ্রহ, অমলেন্দুবাবুর জীবন কাহিনী শোনার।

- 'শহরের বিখ্যাত একটি শপিং মলে গেলাম শপিং করতে। সেই ফ্লোরিডা নামের শপিংমলে শুধুমাত্র ধনীরা যায় শপিং করতে। তো সেখানেই ঘটল একটি অঘটন। একজন ভদ্রমহিলার কোল থেকে একটি পোষা কুকুর লাফিয়ে নেমে এসে, আমার পায়ে কামড়ে দিল। এত দ্রুত ঘটনাটি ঘটে গেল যে এজন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। ভদ্রমহিলা লজ্জিত হয়ে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বড় একটি নার্সিংহোমে গেলেন। সেখানে আমার চিকিৎসা হল।

ভদ্র মহিলার নাম এন্ড্রোডেলা। আমার সঙ্গে পরিচয় হল। আমি ইন্ডিয়ান - বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের দেশের লোক অবগত হয়ে ডেলা আমাকে জোর পূর্বক ওর বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল। ওদের বাড়িটা প্রকৃতপক্ষে একটি খামার বাড়ি। বিশাল এরিয়া প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এক পাশে খুব সুসজ্জিত এবং আধুনিক সুবিধেযুক্ত একটি বাড়িতে ডেলারা থাকত। ডেলা মা বাবার একটি মাত্র আদরের মেয়ে। খামারবাড়ির অন্য অংশতে বিশাল আঙুর ফলের বাগিচা। অনেক

লোকজন সেখানে হইচই করে কাজ করত। আঙুর প্যাকিং করে বাজারে পাঠানো, গাছে জল দেওয়া, শুকনো পাতাগুলি ছেঁটে ফেলা, সমস্ত কাজকর্ম লোকগুলোর উপর দায়িত্ব ছিল। ডেলা দিনান্তে একবার বাগানে গিয়ে দেখাশোনা করে লোকজনদের পারিশ্রমিক মেটাতো। শ্রমিকরা ওকে খুব শ্রদ্ধা করতো। মনোযোগ সহকারে কাজকর্ম করতো ওরা। ডেলা শ্রমিকদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে দিয়ে খুশি রাখতো।

ডেলা আমার সঙ্গে নিভৃতে অনেক সময় কাটালো। আমার সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিচ্ছিল। সে আমাকে পেয়ে মহাখুশি। ছাড়তেই চায় না। আমারও তাড়া ছিল না। অবশেষে সে ওর মনের কথা আমাকে সামনাসামনিই বলে দিল। ডেলা আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমার অমত ছিল না। আমাদের বিয়েটা খুব ধুমধাম করে হয়ে গেল।

ডেলাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম। সে খুব ভালো মেয়ে ছিল। আমাকে সর্বদা সুখী রাখতে চাইত। আমি সারাদিন বাড়িতে শুয়ে-বসে কাটাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম কিছুদিনের মধ্যে। আমি তাই বাগিচা দেখভালের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিলাম। ডেলা অনেকটা মুক্ত হল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তখন আমার কাজগুলো করে দিত। জামা-কাপড় কেচে ইস্ত্রি করে তৈরি রাখত। আমার জন্য অত্যন্ত সব স্বাদিষ্ট খাবার রান্না করতো। এবং মাঝে মাঝে শপিংয়ে যেতাম। ফ্লোরিডা কমপ্লেক্স। যেখানে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, দুজনের। অমলেন্দুবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। গৌরাঙ্গবাবু প্রশ্ন করলেন, 'তারপর কী হল দাদা? '

অমলেন্দুবাবু পুনঃরায় বললেন, 'বছর দুই আমরা মহাসুখে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। ডেলা আমার খুব বাধ্য ছিল। কোনও কাজে ওকে বিরক্ত হতে দেখিনি। ভুল কিছু করে ফেললে মিষ্টি করে হাসতো। সব স্বীকার করতো। একদিন ইস্ত্রি করতে গিয়ে আমার একটি জামা পুড়িয়ে ফেলেছিল। আমি ওকে হাসতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম : ব্যাপার কি এতো হাসছো কেন? ডেলা আমায় জামাখানা দেখিয়ে বলল, 'পুড়িয়ে ফেলেছি। তোমাকে আজকেই এই রঙের একটি জামা কিনে দেব ভাবছি । ফ্লোরিডায় জামাটি কিনেছিলাম না?' আমি বললাম, হ্যাঁ। ডেলা আমাকে আদর করে বলল, 'রাগ করোনা সোনা।' এর সরল মন দেখে আমার খুব হাসি পেল। বাচ্চাদের মতো সাধাসিধে মন ছিল ডেলার।

একদিন কাজ থেকে ঘরে ফিরে দেখি, ডেলা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছে বিষণ্ন মনে। ওর মা পাশে বসে, মেয়ের মাথায় হাত বুলুচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী আজ? তুমি চুপচাপ কেন ডেলা? ও উত্তর দিল না। চোখের কোণে অশ্রু গড়িয়ে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। আমার শাশুড়ি মেয়ে উত্তর দিলেন, 'ডেলার রক্ত বমি হয়েছে। ওর মন খারাপ তাই। '

আমি বললাম, এতে চিন্তার কি আছে পাগলি? আমি তোমাকে বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তোমার কিছু হবে না দেখো। ডেলা তুমি মন শক্ত করো। ডেলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার জন্য তোমরা চিন্তা করোনা। আমি হয়তো আর বাঁচব না। শীঘ্রই ঈশ্বরের ঘরে চলে যাব।' কথাটি শুনে আমার হৃদয়টা ধক করে উঠল। অসীম শূন্যতা অনুভব করলাম নিমেষে। ডেলা ছাড়া আমার আর পৃথিবীতে কেউ এত আপন ছিল না। হে ঈশ্বর তুমি ডেলাকে রক্ষা করো। আমি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম।

ডেলাকে আমি একটি বড় নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিলাম। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল। কোনও লাভ হল না। ডেলার কোলন ক্যান্সার হয়েছিল। ডাক্তারবাবুরা জবাব দিলেন। সে মাস খানেকের মধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আমি ডলার মৃত্যুতে খুব ভেঙে পড়েছিলাম। ওর স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে ছিলাম। আমি তখন দেশে ফিরতে পারতাম। কিন্তু ডেলা আমাকে বিশাল একটি দায়িত্ব সঁপেছিল ওর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মা-বাবাকে যেন দেখি। ওদের সেবা-যত্ন যেন করি। ডেলার আঙুর বাগিচা শ্রমিকদের যেন কোনওরকম অসুবিধে না হয়। শ্রমিকরা বড্ড গরীব। সারাদিন পরিশ্রম করে। হাড়ভাঙা খেটে সামান্য রোজগার করে। তাতেই ওদের পরিবার প্রতিপালিত হয়। দুটো খেয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকে লোকগুলো। আমি ওদের যেন কষ্ট না দিই। ডেলা আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, ওর শরীর ছুঁয়ে। আমি ডেলাকে কথা দিয়েছিলাম। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অমলেন্দুবাবু। তারপর পুনঃরায় বললেন, 'তারপর একে একে ডেলার মা বাবার মৃত্যু হল কয়েক বছরের ব্যবধানে। আমি পৃথিবীতে একা হয়ে পড়লাম। মনটা ভেঙে গিয়েছিল। একরাশ বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছিল। কোনও কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। তাই একদিন ডিসিশন নিলাম দেশে ফিরব। ডেলার বিষয়-সম্পত্তি ওর প্রিয় শ্রমিকদের সবার নামে দলিল করে বিলিয়ে দিয়েছি। তারপর সমস্ত বাধা বন্ধনমুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এলাম। জীবনের বাকি সময়টুকু দেশের মাটিতে এবং তোমাদের সঙ্গে শান্তিতে কাটাতে চাই ভাই। তোমরা যদি আমাকে অ্যালাউ করো।'

অমলেন্দুবাবুর কাহিনী এখানেই শেষ হল। সবকিছু শুনে গৌরাঙ্গবাবু বললেন : 'তা বেশ করেছো দাদা। কিন্তু কথা হল তোমাকে রাখি কোথায় বলো তো? সবে তো তিনটে ঘর তুমি আমাদের মত কষ্ট করে –

তাঁকে বাধা দিয়ে অমলেন্দুবাবু বললেন – 'সে নিয়ে ভাই ভেব না। একটু ঘরের কোণ পেলেও চলবে।'

- সে কি করে হয় তুমি আমার দাদা হয় তোমাকে অসম্মান করতে পারি। সে ধর্মে সইবেনা দাদা। তুমি বরং তনয়ের সঙ্গে এক ঘরে থাকবে।'

সুলক্ষ্মী এতক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দাদা ভাইয়ের কথা শুনছিল। এবারে কণ্ঠ চড়িয়ে প্রশ্ন করল : 'হ্যাঁ গো দাদা আপনি তো বহুদিন চাকরি-বাকরি করছেন শুনলাম। তারপর বড়দির বিষয় সম্পত্তি, টাকা-পয়সাও নিশ্চয়ই পেয়েছেন তবে তো অসুবিধার কথা নয়। আপনি বরং নিজের জন্য দু কামরা ঘর তৈরি করেই নিন।'

অমলেন্দুবাবু প্রত্যুত্তরে বললেন : 'অর্থকড়ি আমার তেমন কিছু নেই ছোট বৌ। সবকিছু তো ডেলার চিকিৎসায় ব্যয় হয়ে গেছে - যা আছে আমার খাওয়া পরা তাতে চলে যাব। তোমাদের আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

সুলক্ষী না অলক্ষ্মী, সে ভগবানই জানেন। তিনি বড়দার অর্থকড়ির পরিমাণ কথার মাধ্যমে জানবার প্রচেষ্টা করছিলেন কিন্তু জীবনে পোড়খাওয়া অমলেন্দুবাবু ছোট বৌয়ের কৌশল উপলব্ধি করে তার উপযুক্ত জবাবে সুলক্ষ্মীর অন্তরাত্মাকে ঘায়েল করলেন। ছোট বৌয়ের মুখটি কালো হয়ে উঠল নিমেষে। তিনি তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরের দিকে দ্রুত গতিতে উধাও হলেন। বড় মেয়ে টিনা পুঃনরায় জেঠুর জন্য চা নিয়ে এল। অমলেন্দুবাবু হাত বাড়িয়ে কাপ প্লেটটি ধরলেন এবং ভাইঝির কেশ স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। তিনি মনে মনে এই মেয়েটির প্রতি অতিশয় খুশি হলেন।

অমলেন্দুবাবু খুব দিলখোশ মানুষ। কয়েকদিনের মধ্যে ভাইপো ভাইঝিদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। ওদের সঙ্গে দেশ-বিদেশের কত রকম গল্প বলে মাতিয়ে রাখতেন। তারা অমলেন্দুবাবুর গল্পে বুঁদ হয়ে থাকত। বাচ্চারা খুশি হলেও সুলক্ষ্মীদেবী খুশি হতে পারতেন না। তীব্র প্রতিবাদ করে বলতেন — 'দাদা আপনি ওদের আর মাথা খাবেন না ছাইপাস গল্প শুনিয়ে। ওদের পড়াশোনা আজকাল ডকে উঠেছে দেখছি।' অমলেন্দুবাবু বলতেন — 'ছোট বৌ আমি ওদের মাথা খাচ্ছি না বরং দেশ-বিদেশের গল্প শুনিয়ে বাচ্চাদের জ্ঞানসমৃদ্ধ করছি বুঝলে? তুমিও শুনে দেখতে পারো।'

- 'আমার শোনার এত সময় নেই। এই তোরা যাবি? না, পিঠের ছাল তুলব? যা।'

- সুলক্ষ্মীর ধমকানিতে ছেলে মেয়েরা ভীত হয়ে পালাত। গল্পের আসরে ভাটা পড়ত। একটি সুন্দর পরিবেশকে সুলক্ষ্মী মুহূর্তে শোকের পরিবেশে বদলে দিত। এতে অমলেন্দুবাবুর মনে খুব দুঃখ হতো। তিনি খুব মানসিক আঘাত পেতেন।

সুলক্ষ্মী তাঁর প্রতি যে বিরূপ, অমলেন্দুবাবু তা বিলক্ষণ জানতেন। প্রথমদিন থেকেই ছোট বৌ মানিয়ে নিতে পারছে না। তাকে খুশি করার সবরকম প্রয়াস অমলেন্দুবাবু করে দেখেছেন। তবু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কিন্তু ছোট ভাই গৌরাঙ্গ রায় দাদাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন। তাঁর যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। ছেলে মেয়েরাও জেঠুর নেওটা হয়ে উঠেছে। শুধু ছোট বৌ বিরূপ। কারণটা কী অমলেন্দুবাবু ভেবে পান না।

তার জন্য সংসারে কোনো এক্সট্রা খরচ নেই। তিনিই সংসারের দায়িত্ব নিয়েছেন। সকাল হলেই থলে হাতে বাজারে পৌঁছে যান। বড় দেখে বাজারের সেরা মাছটাই তিনি কেনেন। কচি পাঁঠার মাংস কেনেন। থলে ভর্তি বাজার করে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফেরেন। এই বয়সেও অমলেন্দুবাবু বেশ শক্ত সামর্থ। সত্তর ছুঁই ছুঁই বয়স। তবুও সুলক্ষ্মীর একটু মায়া হয় না। তাঁর ভয় একটাই, ভাসুর যদি বাড়িঘরের অধিকার চেয়ে বসে? সবে তো তিনটি ঘর। আর সামান্য

বাস্তুভিটে। তাঁকে দিলে কী থাকবে? ছেলে মেয়েরা পথে বসবে। টিনা বড় হয়েছে। ওর দেখাশোনা চলছে। জামাই আসবে বাড়িতে। থাকবে কোথায়? এইসব চিন্তা করে সুলক্ষ্মী আপদ বিদেয় করতে পারলেই বাঁচেন।

ইতিমধ্যে পাড়ায় হাটে বাজারে অমলেন্দুবাবুর বন্ধুর সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। অনেক বাল্যকালের বন্ধুদেরও খোঁজ মিলেছে। বাজারে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয়। কুশল বিনিময় হয়। বাজারে বিক্রেতাদের কাছেও এই জাহাজী বাবুটির বেশ কদর, সম্মান আছে। অনেকেই আজকাল বাড়িতে ভীড় জমাচ্ছে, জাহাজের গল্প শোনার জন্য। তাতেও সুলক্ষ্মী খুব অসন্তুষ্ট। তিনি ভাসুরকে স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন, বাড়িটা কোনও আড্ডাখানা নয় দাদা, গল্প করতে হয় লোকজনের বাড়ি গিয়ে আড্ডা মারুন। বাইরের ঝামেলা ঘরে ঢোকাবেন না। অমলেন্দুবাবু নীরবে হজম করেন সেসব কথা। মনে দুঃখ কষ্ট হলেও — কে তার মনের কষ্ট বুঝবে? আজকের দিনে জীবন সঙ্গিনী ডেলার কথা বড় বেশি মনে পড়ে। অমলেন্দুবাবু নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করেন।

গৌরাঙ্গবাবুর বড় মেয়ে টিনাকে পাত্রপক্ষের লোকজন প্রায়ই দেখতে আসছে। টিনা বি এ পাশ করেছে। সে দেখতে সুন্দরী। গান জানে। রীতিমতো সংসারী। এমন মেয়ে যে সংসারে যাবে, সেই সংসারকে সুখী করবে। কিন্তু পাত্রপক্ষের অর্থের দাবি যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। গৌরাঙ্গবাবুর এত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সুলক্ষ্মী বারংবার স্বামীকে মনে করিয়ে দেয় দাদাকে বলো না, উনি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন। এতদিন গৌরাঙ্গবাবু সঙ্কোচ বোধ করেন, বলেন, তুমি তো জানো লক্ষ্মী বড় বৌদির চিকিৎসার জন্য সব অর্থ ব্যয় করে তিনি দেশে ফিরেছেন। এখন কী করে তাঁকে টাকা চাই বলতো? সুলক্ষ্মী তবুও স্বামীকে বেশ চাপেই রাখেন। গৌরাঙ্গবাবু বেশ অসহায়। অমলেন্দুবাবু আইনের সহায়তা নিতেই পারেন। বাবা মায়ের সম্পত্তি থেকে তাঁকে কেউ বেদখল করতেই পারে না। কিন্তু না সে পথে তিনি যেতে চান না। একটু শান্তি চান এই বয়সে। আইন আদালতের ঝামেলায় জড়াতে চান না নিজেকে। অমলেন্দুবাবু তো নিজে থেকেই এসব ছেড়ে গেছিলেন। মা-বাবা আমৃত্যু তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। ছেলে দেশে না ফেরায় সব সম্পত্তি ছোট ছেলের নামে উইল করে দিয়ে গেছেন। কথাটির সত্যাসত্য বিচার কোনদিনও কেউ করেননি। অমলেন্দুবাবু দেখতেও চাননি, সেই উইল। একথা সুলক্ষ্মী রটাচ্ছে।

আজকে টিনাকে দেখতে এসেছে। পাত্র খুব বড় সরকারি চাকুরে, দেখতে-শুনতেও খুব ভালো। টিনার সঙ্গে দারুন মানাবে। পাত্র পক্ষের লোকেরা ওর গুণাগুণ বিচারে ব্যস্ত ছিলেন।

ছেলের বাবা হবু বৌমাকে একটি গান গাইতে গাইতে বললেন। টিনা একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করল। ওরা খুব খুশি হলেন গানটি শুনে। ভালো ভালো খাবার খাওয়ানো হল পাত্রপক্ষের লোকজনদের। আজ সমস্ত কিছু অমলেন্দুবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আয়োজন করেছেন। টিনাকে তিনি বড্ড ভালবাসেন। কিন্তু শেষমেষ পাত্রপক্ষের চাহিদা শুনে, গৌরাঙ্গবাবুদের মাথায় হাত। তবুও এই পাত্র হাতছাড়া করা যাবে না। সুলক্ষ্মী বললেন : তুমি আমার সব গহনা বেচে দাও। আমি দাদাদের কাছে হাত পেতেও টাকা জোগাড় করব। তুমি ছেলের বাবার কাছে একটু সময় চেয়ে নাও। এ

পাত্র কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। কিন্তু গৌরাঙ্গবাবু অন্য চিন্তায় বিভোর ছিলেন। তিনি বাড়িটি বন্ধক রেখে এই টাকা সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলেন মনে মনে।

গৌরাঙ্গবাবু বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে ফেললেন। মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে। সামনের মাসেই টিনার বিয়ে। অর্থ কিভাবে সংগ্রহ হল কেউ বিন্দুমাত্র টের পেলেন না। সবাই খুব খুশি। একদিন অমলেন্দুবাবু প্রকৃত সত্যটি জানতে পারলেন। বাজারে বিকাশ পালের সঙ্গে দেখা। তিনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন একসময়। বিকাশবাবু জানিয়েছেন কথাটি। গৌরাঙ্গবাবু বাড়ির দলিল বন্ধক রেখেছেন, অঘোরনাথ চাটুয্যের কাছে। দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। কথাটি শুনতে ভালো লাগেনি, অমলেন্দুবাবুর। যেমন করেই হোক বাড়ির দলিল ছাড়িয়ে আনতে হবে। এই বাড়িতে মা বাবার কত স্মৃতি লুকিয়ে আছে। তাঁদের শৈশবের দিনগুলির কত কথা ভেসে ওঠে মনের আয়াতে। না আর দেরী করেন না অমলেন্দুবাবু। তিনি ছুটে যান অঘোরনাথ চাটুয্যের কাছে দলিলটা ফিরিয়ে আনতে।

পরের দিন। সকালে অমলেন্দুবাবুকে আর দেখা গেল না। বাড়ির লোকজন হতভম্ব। কোথায় গেল জলজ্যান্ত লোকটি। টিনাই আবিষ্কার করল চিঠিটি এবং বাড়ির দলিল। গৌরাঙ্গবাবু মেয়েকে চিঠিটি পড়তে বললেন। টিনা চিঠি পড়তে লাগল :-

স্নেহের ভাই গৌড়,

আমি বহুকাল দেশ-বিদেশে ঘুরেছি, অনেক মানুষ নর-নারী চিনেছি, জেনেছি। সুলক্ষ্মীকেও আমার বিশেষ ভাবে চেনা হয়ে গেছে। আমি একটু শান্তির আশায় দেশে ফিরেছিলাম ভাই। শেষ জীবনটা তোমাদের ভালোবাসায় কাটিয়ে দেব তা হবার জো নেই। তাই আমি বাড়ি ছাড়লাম। আমার জন্য চিন্তা করবে না। নিশ্চয়ই ভগবান একটি শান্তির নীড় দেখিয়ে দেবে।

টিনাকে আমি সবার থেকে স্নেহ করি। ও আমাকে মায়ের মতো ভালোবেসে আগলে রেখেছিল এতদিন। কিন্তু তোমরা ওকে বিদায় করতে চাইছ তখন আমি এখানে থেকে কী করব? তুমি টিনার বিয়ের জন্য বাড়ি বন্ধক রেখেছিলে আমি অঘোরবাবুকে নগদ দশ লক্ষ টাকা দিয়ে সেই দলিল ছাড়িয়ে এনেছি। তোমরা ছেলে মেয়েদের পথে বসাবে সে আমি সহ্য করতে পারব না। তোমরা সুখী হও, আমি আশীর্বাদ করছি। ভালো থেকো।

ইতি, তোমার দাদা।

গৌরাঙ্গবাবু অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। টিনার চোখে জল। সুলক্ষ্মী হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, মানুষটার এত বড় মন আগে বুঝে উঠতে পারিনি কো। যাও গো তোমরা দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আমি তাঁর পায়ে পড়ে নাক খত দেব।

তনয় বলল, আমি এক্ষুনি স্টেশনে যাচ্ছি। সকালের ট্রেন আসতে এখনও দেরী আছে। সে দ্রুত বাইক চড়ে বাড়ি ছাড়ল জেঠুমনির খোঁজে। সুলক্ষ্মী পিছন থেকে চিৎকার করে বলল : স্টেশনের আশ পাশটা ভালো করে খুঁজে দেখিস বাপ – তোর জেঠুকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। টিনার বিয়েতে তিনি থাকবেন না, সে কি হয়।

***

চিত্রশিল্পীঃ বাপ্পা ভৌমিক

বই কুটির কলকাতার

শিকড়ের টানে

অজন্তা প্রবাহিতা

- রোহন! রাত দশটা বাজে এবার বিছানায় এসো। নইলে কিন্তু পাপা বকুনি দেবে।

মায়ের বকুনিকে পাত্তা না দিয়ে রোহন একমনে দেয়ালে লাগানো ইলেক্ট্রিক সুইচ গুলো মন দিয়ে দেখছিল।

কেমন করে কাঠের বোর্ডের ওপরে লাগানো আছে কালো রঙের গোল গোলসুইচ। মাঝখানে একটা নব। ওপরে করলে লাইট জ্বলছে নীচে করে দিলে লাইট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কয়েকবার সুইচ ওপর নীচে করে আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে দেখে নিল দিল্লির বাড়ির সুইচ বোর্ড থেকে এই বোর্ড এক্কেবারে আলাদা। তারপরেই দৌড়ে গিয়ে বাইরের ঘরে সোফায় বসে থাকা ঋষভের কোলে চেপে দু'হাতে ওর মুখটা তুলে ধরে সুইচবোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগল,"জানো পাপা এইরকম সুইচবোর্ড আমি ডিসকভারিতে দেখেছিলাম। এখানে সত্যি সত্যি দেখছি। এগুলোতো অনেক পুরোনো ডিজাইনের বোর্ড, তাই না! দিল্লি গিয়ে বন্ধুদের বলব, আমি ওল্ড সুইচ বোর্ড দেখেছি। ইট'স অ্যামেজিং পাপা।"

কথাগুলো শুনে মুচকি হাসল ঋষভ। আদর করে ওর চুলগুলো নাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ইয়েস ইউ আর রাইট। দীজ আর ওল্ড সুইচ বোর্ড। অ্যান্টিকপিস্। অনেক রাত হল, এবার চলো শুয়ে পড়ি। কাল ভোরে উঠে দাদুর সাথে বাগানে কাজ করতে হবে তো।"

--ওকে পাপা। গুড নাইট।

দিল্লি নিবাসী ঋষভ ও নিশার একমাত্র ছেলে রোহন। বয়স মাত্র নয় বছর। ক্লাস ফোরে পড়ে।

এত বছর ধরে বাবা-মায়ের ছুটির অভাবে দাদুর বাড়ি (আসামের ডিগবয়ে) যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেই কোন ছোট্টবেলা দাদুর বাড়ি এসেছিল সেইসব স্মৃতি আজ ওর মনে নেই। এবারে ঠাকুমার জেদে অনেক দিনের জন্য দাদুর বাড়ি আসা। করোনার জন্য এখন মা ও বাবা দুজনেই বাড়িতে বসে কাজ করছে, ওরও স্কুলে যাবার বালাই নেই, অনলাইনেই ক্লাস হচ্ছে। কাজেই সেই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে দাদুর বাড়ি এসে থাকলে মন্দ কী! পিসিরাও কাছাকাছি থাকে। সবার সাথে দেখাও হবে, কাজেরও ক্ষতি হবে না। এখানে এসে থেকে দাদু-ঠাম্মির সঙ্গে এতো সুন্দর ভাবে দিন কাটছে যে দিল্লির কথা একবারও মনে পড়ছে না।

দাদু প্রতিদিনই ভোরে ওঠে। জলখাবার শেষ করে বাগানের কাজে লেগে যায়। এখন ওনার সঙ্গী হয়েছে রোহন।

দিল্লির ফ্ল্যাট বাড়ির ব্যালকনি ও কিচেনের সঙ্গে ছোট ছোট কিচেন গার্ডেন ও ব্যালকনি গার্ডেন থাকলেও বাড়ির পেছনে দাদুর বাগানের মতো বড় খোলামেলা বাগান কখনওই দেখা হয়ে ওঠেনি ওর। দাদুর বাগানে অনেক রকমের গাছ আছে। তার মধ্যে পেয়ারা, কাঁঠাল, সুপুরী, কুমড়ো গাছকে এর মধ্যে রোহন চিনে ফেলেছে। আর বেশ কিছু গাছের নাম জানা এখনও বাকি আছে। বাগানের একপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঠাম্মির ফুলের গাছ। সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে ফুটেছে মরশুমী গাঁদাফুল আর ডালিয়া, নানান ধরণের জবাফুল, টগরফুল, শিউলি, স্থলপদ্মও আছে। এখানে কেউ বাজার থেকে ফুল কেনে না। সবার বাড়িতেই ফুল গাছ আছে। রোজ সকালে একটা সাজি আর কোটা (ফুল পাড়ার লাঠি) নিয়ে ঠাম্মি ফুল তোলে আর সেই ফুল দিয়েই রোজ পুজো করে। বাগানের একপাশে ছোট্ট করে একটা তুলসীবনও আছে। সেখান থেকে তুলসী পাতা তুলে ঠাম্মি রোজ রাতে সবাইকে 'কাড়া' বানিয়ে দেয়। ''কাড়া খাও করোনা ভাগাও'' বলে রোজ ওই কাড়া ঝাঁঝওয়ালা জিনিসটা খাইয়ে দিয়েই ঠাম্মি রোহনের মুখে একটা নারকোল নাড়ু গুঁজে দিয়ে বলে, ''এই তো আমার শক্তিমান দাদুভাই।''

কয়েকদিন আগে দাদু একমুঠো গোটাধনে জলে ভিজিয়ে রেখেছিল। রোহন রোজ একবার করে ধনে ভেজানো বাটির জল পাল্টে দিয়ে অপেক্ষা করে কবে ও-থেকে ছোট ছোট শেকড় বেরোবে। তারপর সেগুলোকে সুন্দর করে মাটিতে পুঁতবে। সেখান থেকেই ধনেপাতা গাছ হবে। ঠাম্মি তাই দিয়ে 'গ্রীন-চাটনি' বানাবে। যেদিন ডিগবয়ে পৌঁছালো ওর সামনেই বাগান থেকে দাদু গাজর তুলে এনেছিল আর সেই গাজরের তরকারি বানিয়েছিল ঠাম্মি। আহা কি স্বাদ সেই তরকারির। সেদিন থেকে ও নিজে হাতেই খাবার খাচ্ছে। নিশাকে আর কষ্ট করতে হয় না। এখানে এসে বাগানের তাজা শাক সবজি দেখে ওর খাবার অভ্যেস এক্কেবারে পাল্টে গেছে। এখন 'জাঙ্কফুড' খাবার বায়না করে না। এইসব দেখে নিশা আর ঋষভ খুব খুশি। নিশা বলে, ''ঋষভ! এ তো মিরাকেল হয়ে গেল। যেই ছেলেকে খাবার খাওয়ানো মানে মনে হতো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করছি, সেই ছেলে আজ নিজে হাতে সোনামুখ করে সব তরিতরকারি খেয়ে নিচ্ছে। ভাবাই যায় না!''

''পরিবেশে বাচ্চাদের স্বভাবের বদল হয় নিশা", বলে মুচকি হাসল ঋষভ।

ধনেবীজগুলো মাটিতে পোঁতার পর কিছুদিনের মধ্যেই ছোট ছোট ধনেগাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সন্ধেবেলা ফাঁক পেলেই রোহন আলমারি থেকে দাদুর টর্চ বের করে বাগানে ছোটে গাছগুলো কেমন আছে দেখবার জন্য। একদিন, অন্ধকারে ঘাসের ডগায় ছোট্ট ছোট্ট টুনি বাল্বের মতো জ্বলতে নিভতে দেখে খুব অবাক হয়। টর্চ বন্ধ করে আলোগুলো

ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। তারপরেই ছুটে এসে বাবাকে টানতে টানতে বাগানে নিয়ে গিয়ে সেই আলোকে দেখিয়ে বলে, “সি পাপা! হাউ অ্যামেজিং! হোয়াটইজ দিস?”

“এগুলো জোনাকী। একধরণের পোকা। রাতের অন্ধকারে দেখা যায়। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন এই জোনাকীদের সাথে এক বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল আমাদের। এদের ধরে বোতলে ভরে পড়ার টেবিলের একপাশে রেখে দিতাম। বোতলের মুখে ছোট্ট ছোট্ট ফুটো করে দিতাম যাতে এরা হাওয়া পায়। রাতে যখন লোডশেডিং হতো সেই বোতলের ভেতরে ওদের গা থেকে এই আলো জ্বলতো নিভতো। সেই দেখে আমি আর দিদি হাততালি দিতাম।”

ঋষভের কথা শেষ হতেই লোডশেডিং হয়ে গেল। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে, আর ঘাসের ডগায় জোনাকীরা হাওয়ার সাথে দোল খাচ্ছে। অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে থাকে রোহন।

“ঋষভ, দাদুভাইকে নিয়ে ঘরে আয়”, ঠাম্মির ডাক।

ঘরে ঢুকতেই হ্যারিকেনের আলো দেখে আবার অবাক হয় রোহন।

“হ্যারিকেন!” আমি 'কাবাব জাংশনে' খাবার খেতে গিয়ে দেখেছি।

“হ্যা বেটা। আমরা ওখানে যে হ্যারিকেন দেখেছিলাম সেগুলো ছোট্ট ছোট্ট হ্যারিকেনের রেপ্লিকা, শোপিস হিসেবে দেয়ালে সাজানো ছিল। ওর ভেতরে ছোট্ট জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল আর এখানে কেরোসিন দিয়ে হ্যারিকেন জ্বালানো হয়।

“ওকে পাপা”

রাতে খাবার শেষে ঋষভের কোলে বসে পা দোলাতে দোলাতে রোহন জিজ্ঞেস করে, “পাপা! ডিগবয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি টিভিতে, ভিডিও গেমে যা দেখেছি এখানে সব রিয়ালিটিতে আছে আর দাদু ঠাম্মিকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। আমরা কি এখানে শিফট করতে পারি না?”

রোহনের কথাগুলো শুনে ঋষভ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, “আমিও তো তাইই চাই বেটা। শেকড়ের টান কি ভোলা যায়? মা বাবার ভালোবাসা, আদর, স্নেহ মমতা সেসব কি আর দিল্লির কংক্রিটের জঙ্গলে পাওয়া যায়? মাঝে মাঝেই মনে হয়, অনেক হল, বড় শহরের মায়া, আর নয়, এবার ফিরে যাই। কিন্তু, ফিরব বললেই কি ফেরা যায়? সেকথা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে।”

***

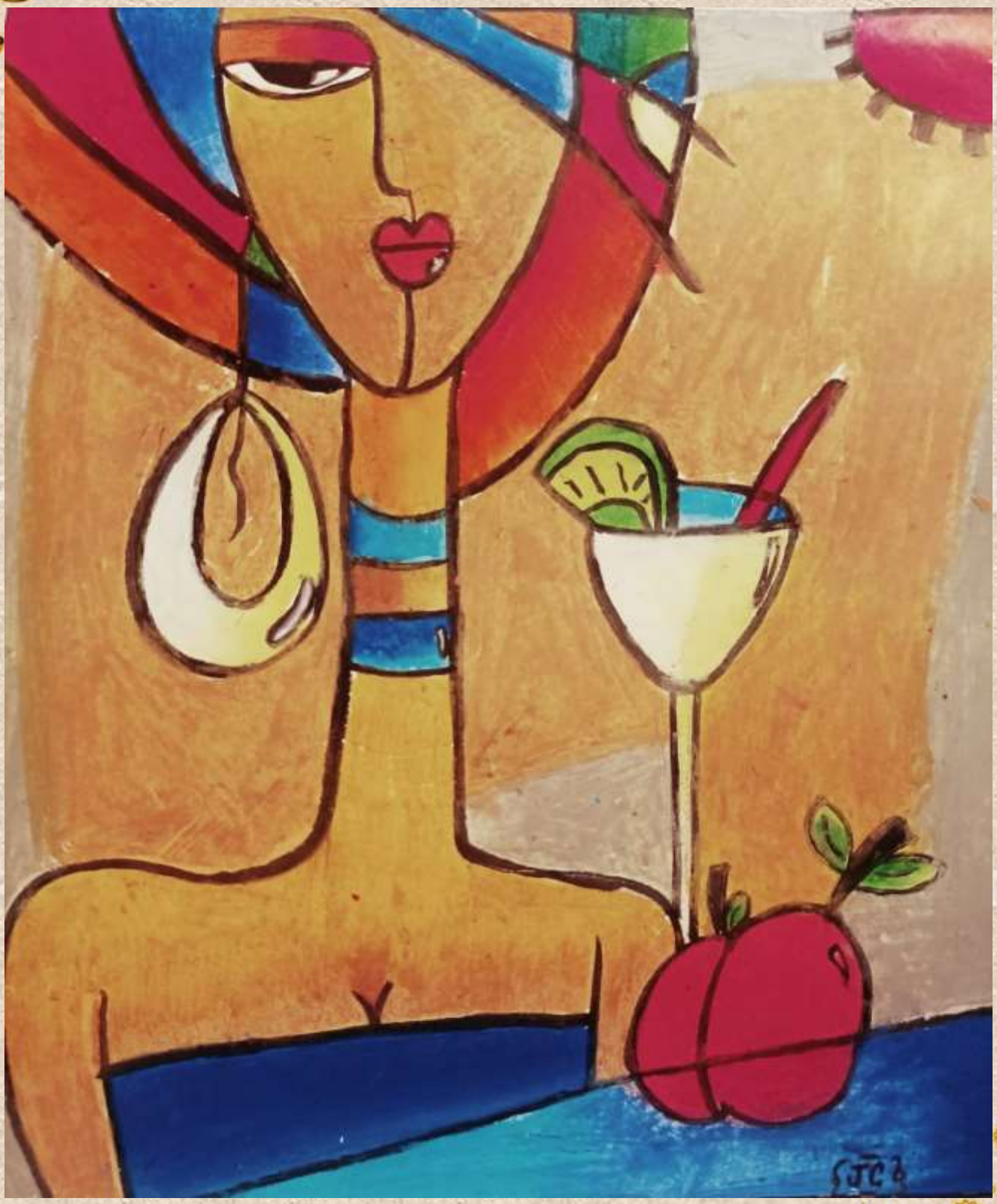

শিশুশিল্পীঃ ডসলীনা চক্রবর্তী

সুপ্ত আগ্নেয়গিরি

অগ্নিমিতা দাস

মিলির হাতে দামী ব্র্যান্ডের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে

নেহা বলল - ওমা! এটা অহনার ঘড়ি না!

অহনা তাড়াতাড়ি বলে উঠল - আমি ওরটা পরেছিলাম, ওটা মিলির!

– কিন্তু তুই বললি যে এটা তোর কানাডায় থাকা মাসি প্রেজেন্ট করেছে!

– ও, বলেছিলাম বুঝি! কি জানি বলে অহনা হাত উল্টোলো।

রেস্তোরাঁয় বসা এডিকেট মানা বন্ধুরা কথা পাল্টে দিল!.

অহনার এই ভালোমানুষী দেখলে মিলির মাঝে মাঝে গা জ্বালা করে।

সবাই জানে অহনার ব্যবহার করা জিনিস মিলি পরে, পরে তো পরে, তাতে কি হয়েছে!

সেটাকে ঢাকতে যাওয়ার কি দরকার!

অহনা ভাবে মিলি বোধহয় কিছু মাইন্ড করবে, কিন্তু

তাতে যে ওর আরও খারাপ লাগে সে বোধ ওর নেই।

অহনা বরাবরই আদুরে আর খুব ভালো মেয়ে!

রায়চৌধুরী পরিবারের আদরের মেয়ে অহনার গভারনেসের মেয়ে মিলি, মায়ের সাথে ওদের বাড়িতেই থাকে!

বিগত চব্বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল!

মিলির মাকে অহনা নিজের মায়ের মতই দেখে, মিলি কে নিজের বোন!

অহনা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়লে ও মিলি কে ও কিন্তু পাড়ার সদ্য গজিয়ে ওঠা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করা হয়।

বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিয়েষ্ট কুনাল রায়চৌধুরী উদার মনের মানুষ। বাড়িতে মিলিকে নিজেদের মেয়ে বলেই দেখা হয়। তাছাড়া অহনা তো মিলি অন্ত প্রাণ।

মিলিকে না নিয়ে ও কোন কাজ করবেই না!

তাই অহনার জেদেই মিলি আর ও এক কলেজে পড়ে! মিলি ছোট থেকেই দেখে এসেছে অহনার নামী দামী জামা, ঘড়ি, জুতো সব কিছুই ও পেয়েছে ওর পরার পর!

হয়তো একদিন পরেছে তার পরেই সেটা চলে গিয়েছে মিলির দখলে!

মিলিকেও দেওয়া হয় কিন্তু অত দামী না!

তাছাড়া দরকার কি!

যেখানে অহনার দৌলতে ওর আলমারি

ব্র্যান্ডেড জামা, জুতোয় ভরা!

একবার মিলির খুব মনে আছে ওর দশ বছরের জন্মদিনে অহনার মা প্রমিতা রায়চৌধুরী তাকে অহনার দুমাস আগের বার্থডের পরীর মত গাউনটা দেয়।

অহনা একদিনই পরেছিল, যেই মিলির পছন্দ হয়েছে ওমনি অমন দামী গাউন মিলিকেই দিতে হবে!

মিলি সেদিন অহনার নয়, মিলির নিজস্ব নতুন আনকোরা জামা পরতে ইচ্ছে করছিল!

মিলির বার্থডেও দারুন ভাবে সেলিব্রেট করা হল,

কিন্তু বার্থডে গার্ল অহনার গাউন পরলো!

সেদিন মিলি রাতে রাগে ফুঁসছিল, মা! তুমি নিজের পয়সা দিয়ে আমায় একটা নতুন গাউন কিনে দিতে পারলে না? কেন আমায় বারবার ওর পরা জামা পড়তে হবে। জন্মদিনের দিনও!

মিলির মা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল - তোর লজ্জা লাগে না! তোর বাবা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ওনারা যদি থাকতে না দিতেন, আমাদের কি অবস্থা হতো ভেবে দেখেছিস।

তাছাড়া ওরা তোকে মেয়ের মতো ভালোবাসে।

অহনা তো মিলি বলতে অজ্ঞান। তাছাড়া এত দামী গাউন কিনে ও তো আলমারি বন্দি হয়েই থাকতো। কি দরকার বাবা! ভালোবেসে দিয়েছে আর তুই বসে বসে প্যাঁচ কষছিস!

মিলি সেদিন মাকে ওর কষ্টের কথাটা বোঝাতে পারলো না। একটা চাপা অভিমান বুকে গুমরোতে লাগলো।

অহনার বিয়ে ঠিক হল বড়ো বিজনেস ম্যানের বাড়ির এন আর আই ছেলের সাথে!

ছেলের পৈতৃক বাড়ি দিল্লিতে।

কিন্তু কলকাতাতেও বাড়ি আছে!

ঋত দেশে ফিরলে অভিভাবকদের কথায় কলকাতায় আসে!

শুরু হয় দুজন দুজনকে দেখাশোনার পালা!

কখনও রেস্তোরাঁয়, কখনও মলে, মাল্টিপ্লেক্সে মুভি

দেখা, ডিস্কোতে দেখা সাক্ষাৎ চলতেই থাকে!

অহনার সাথে অবশ্যই মিলি থাকে!

ঋত অবশ্যই অহনাদের কমন ফ্রেন্ডের মত মিলির সোশ্যাল স্ট্যাটাসটা জানতে পেরেছে!

মিলি ছোট থেকেই বলিয়ে কইয়ে!

মাঝে মাঝে তো ঋত আর মিলি খোশমেজাজে আড্ডা দেয়! মিলি ঋতের সাথে রাজনীতি থেকে ফিল্ম, ফ্যাশন সবেতেই সাবলীল ভঙ্গিতে গল্প করে। অহনা শুধু শ্রোতা হয়েই থাকে!

সেদিন রাতে শুয়েমিলি বলে, ফ্র্যাকলি স্পিকিং! তোর ভয় হয় না ওই রকম হ্যান্ডু যদি তোর বদলে আমার প্রেমে পড়ে যায়!

অহনা বলে ওঠে, ভাট বকিস না!

- কেন আমি না হয় তোর মত ধবেধবে ফর্সা, মাখন সুন্দরী নই বাট আমি ও যথেষ্ট অ্যকট্রাকটিভ, সেক্সিফিগার, মাখন নই পুরো ছুরি, চাক্কু সে জিগারআর পার হো যা গ্যায়া!
- চুপ করে শো তো! কিছুই মুখে আটকায় না!

তুই যত বড় সুন্দরী হোস না কেন আমার ঋতের দিকে ভুলেও তাকাবি না!

এই বিশ্বাস আমার আছে!

- বাবা! আমার ঋত! কতটুকু চিনিস ওকে, সবে তো একমাসও হয় নি!

– বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক করেছে, বিয়ে হবে

চেনা অচেনা জানি না!

তোকে আমি ছোট্ট থেকে চিনি, রাত হয়েছে!

গুড নাইট!

অহনা ঋতের জন্য পছন্দ করে মান্যবর থেকে পাঞ্জাবি কিনলো। ঋতের ট্রাডিশনাল ড্রেস খুব পছন্দ।

সেদিন আবার একা একা গিফট টা নিয়ে ঋতকে

সারপ্রাইজ দেবার ইচ্ছে ছিল, বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে, কারণ পরদিন ঋতের জন্মদিন!

সকাল থেকেই অহনার পেটটা ব্যাথা ব্যাথা করছিল!

দুপুর থেকে আরও বাড়লো, অগত্যা মিলিই সহায়!

মিলি বেজার মুখে বিকেলে ক্যাব নিয়ে রওনা হল!বাড়ির গাড়ি নেওয়া যাবে না!

ট্র্যাফিক জ্যাম না থাকায় যোধপুরপার্ক থেকে সল্টলেক বেশিসময় লাগল না!

দরজায় বেলের আওয়াজে ঋত দরজা খুলে মিলিকে দেখে বেশ অবাক!

- কি হল উড বি আসেনি, বলে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি!

- ইয়েস, ইয়েস কাম ইন, ঋত অপ্রতিভ মুখে বললো!

তিনঘন্টা পর মিলি যখন গাড়িতে উঠলো, তখন সাইলেন্ট করা মোবাইলে দেখলো ত্রিশটা মিস কল!

অহনা, প্রমিতা, মিলির মা সবাই কল করেছে!

অহনা বোধহয় ঋতকেও কল করেছিল, কারন ওর ফোনটা বারবার ভাইব্রেট হচ্ছিল!

মিলি ইচ্ছে করেই ফোনটা আনমিউট করল না!

ব্যাগ থেকে আয়নাটা বার করে থেবড়ে যাওয়া আইলাইনার, লিপস্টিক ঠিক করতে করতে মনে মনে ভাবছিল, আজকের সন্ধ্যায় সে বুঝেছে ঋতের জীবনে সে হয়তো প্রথম নয় কিন্তু অহনার জীবনে ঋত প্রথম!

এখানেই মিলির প্ল্যান সাকসেসফুল হয়েছে!

এবার অনন্ত মিলি অহনার আগে ঋতকে পেয়েছে!

মিলি আগে পরে অহনা!

কিন্তু তবুও কেন তার সদ্য লাগানো আইলাইনার ছাপিয়ে বৃষ্টির ধারা গাল দিয়ে নেমে আসছে!

কেন মনে হচ্ছে গাড়ি থেকে নেমে দূরে কোথাও পালিয়ে যাই, যাতে অহনাকে মুখ দেখাতে না হয়!

বুকটা কেন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে বিজয়নী মিলির!

মিলি ঝাপসা চোখে দেখলো তার হাতে অহনার রিস্টওয়াচটাতে ন'টা পনেরো বাজছে!!!

***

শিশুশিল্পীঃ আরাত্রিকা মন্ডল

কুম্ভকর্ণের বেলোর কীর্তি

দিব্যেন্দু ঘোষ

হঠাৎ যদি ঘুম ভাঙায় কেউ

স্বপ্ন শেষের আগে

মুখখানা তুই এমনি করবি

যেন প্যাঁচা লাগে

নালিশ শেষে ঐ শালাকে

দিবি আমায় তুলে

ঘুম ভাঙানোর অপরাধে

চড়াবো তাকে শূলে

(পরাণের ভাই কুম্ভকর্ণকে নাকি এমনি বলেছিল দাদা রাবণ)

কথায় বলে, রাবণের রাগ। ভাইকে প্রবল ভালবাসতেন। কুচুমুচু করে আদরে ভরিয়ে রাখতেন ভাই কুম্ভকর্ণকে। আর গাবদা পেট, ভক্ষণে সুপটু ব্যাটা কালো কুচকুচে কুম্ভকর্ণও নাকি দাদাকে পেল্লায় ভক্তিচ্ছেদ্দা করত। কথায় কথায় নাকি কাঁদত। নাকি কান্না। মানে, ওই ন্যাকা কান্না আর কী! চোখের সঙ্গে টসটস করে গড়াত নাকের জলও। সেই জলে নাকি আস্ত একটা সমুদ্রের জন্ম। কারা যে সব এসব ফুক্কুরি কাটে কে জানে! জোকার না জুকের কে একটা লোক আছে না, কী সব বানিয়েছে, সেখানে মুখ আর বুক সব সমান। ফ্রেরেসবুক না কী! বলিহারি ঢং। একটা জুতসই সাবজেক্ট পেলেই হল। ম্যাটারে আদিখ্যেতার বন্যা। নদী উপচে, সাগর উপচে যে বান আসে, তেমনই বান। আদিখ্যেতার বান। আদিঅন্ত কিস্যু নাই। শুধু চ্যাংড়ামো আর ফাজলামো। সেখানেই সব বিদঘুটে পাজি হতচ্ছাড়ারা কুম্ভকর্ণের ঘুম নিয়ে ধ্যাস্টাতে ধ্যাস্টাতে টঙে তুলেছে আঁতলামো। ব্যাটা কুম্ভকর্ণ কোন ছুন্দরীর স্বপ্ন দেখছিল কে জানে। তাকে নাকি ফ্লাইং কিস্সিও দিচ্ছিল। কেন রে বাপু, রাক্ষস বলে কি পেরেম করতেও নেই। তা, সেই স্বপ্ন-পেরেমে নাকি অ্যামন

চাটা চেটেছিল ইন্দ্র, কুম্ভকর্ণের ঘুম নাকি ছমাস আগে ভাঙতই না। হেব্বি বীর ছিল সে। রাম-রাবণের যুদ্ধে নাকি বেজায় বেগ দিয়েছিল দেবতাদের। পাজি হতচ্ছাড়ার মজা দেকাচ্চি বলে নাকি ভেংচি কেটেছিল লক্ষ্মণ। দেবতাকুলের মাতব্বর ইন্দ্র নাকি প্রবল ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে একসা হয়েছিল। কুম্ভকর্ণের দৈত্যের মতো শক্তি। আর ইন্দ্রের টিংটিঙে শরীর। পাঞ্জায় কী আর এঁটে ওঠা চাড্ডিখানি কথা, বস। ব্যস, অমনি প্যাঁচ কষা স্টার্ট। দেবী সরস্বতীর কাছে হত্তে দিয়ে পড়ল ইন্দ্র। বিদ্যের দেবী সরস্বতীও কুম্ভকর্ণের জিভে এমন মোক্ষম ঠোকা ঠুকল যে, আলটাকরা, দাঁত, মাড়ি সবখানে জিভ আটকে একসা। কথা বলতে গেলেই তোতলানো শুরু। "ই''-কে বলে "নি''। দেবতাকুলের তো পোয়া সাড়ে বারো। প্রজাপতি ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে কুম্ভকর্ণ যখন ইন্দ্রাসন বর চায়, ব্রহ্মা সেটাকে নিদ্রাসন ভেবে বসেন। তারপর থেকে কুম্ভকর্ণ টানা ছমাস ঘুমিয়ে থাকত। অল্প সময়ের জন্য ঘুম ভাঙত। তারপর আবার নিদ্রাদেবীর কোলে সটান শয়ন। এমন বিশাল এক বীর, জীবনভর কাটিয়ে দিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। ভাবা যায়! রামায়ণে নাকি লেকা আছে, রামের সঙ্গে রাবণের কুলিয়ে উঠতে না পারার অন্যতম কারণ কুম্ভকর্ণের ওই দুদ্দাড় ঘুম। কালের পরিক্রমায় বাংলা বাগধারাতেও ঢুকে পড়ে ওই ঘুম। কারও ঘুম ভাঙতে দেরি হলেই বলি, কুম্ভকর্ণের ঘুম। ব্যাটা রাবণের ভাই শুধু ঘুমিয়েই বিখ্যাত হয়ে গেল মাইরি। এ কালের বহু রাবণ আড়ালে-আবডালে অনেক আঁতেলামো মার্কা বুলি কপচায়, কী দারুণ পরিহাস। এমনতরো অজেয় বীর বাগধারায় পরিহাসের পাত্র হয়ে কাটিয়ে দিল আজন্মকাল।

পুরাণ বলে, কুম্ভকর্ণর আক্ষরিক অর্থ কুম্ভ অর্থাৎ কলসির মতো কর্ণ অর্থাৎ কান। হিন্দুপুরাণ রামায়ণে কুম্ভকর্ণকে রক্ষকুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর বিরাট দানবাকৃতি চেহারা এবং খাদ্যাভ্যাসের অস্বাভাবিকত্ব সত্ত্বেও তাঁকে সুচরিত্র এবং দক্ষ যোদ্ধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও তিনি রাম-রাবণ যুদ্ধের এক পর্যায়ে নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য বহু বানরসৈন্যকে হত্যা করেন। আলবেনীয় ভাষায় কুম্ভকর্ণ চরিত্রটি জেতুর নামে পরিচিত। ভাগবত পুরাণ মতে, কুম্ভকর্ণ ছিলেন বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক বিজয়ের অবতার। জয় ও বিজয় শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র বৈকুণ্ঠদ্বার রক্ষার সময় চতুর্কুমারের দ্বারা শাপগ্রস্ত হন। তাঁরা প্রাথমিকভাবে অমর বরপ্রাপ্ত হলেও বিষ্ণুর সহকারী হিসাবে আত্মসমর্পণের পর তিনিই এই বর স্খালনে সচেষ্ট হন। তিনি বিজয়কে বলেন যতদিন না তিনি তাঁদের আসার অনুমতি দিচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত মর্ত্যলোকে তিনবার তিনি বিষ্ণুর অবতারের শত্রুপক্ষের সদস্য হিসাবে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁদের তিনটি পুর্বনির্ধারিত জন্মের দ্বিতীয় জন্মে জয় রাবণ হিসাবে এবং বিজয় তাঁর ভাই কুম্ভকর্ণ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন।

রাম-রাবণের যুদ্ধে এই কুম্ভকর্ণ বানররাজ সুগ্রীবকে অবচেতন করে দেন। এবং বানরকুলের সংহার করতে সক্ষম হন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি রামের হাতে নিহত হন। যখন রাবণ তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পান তখন তিনি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং নিজেকে যুদ্ধবিদ্ধস্ত হিসেবে জাহির করেন। কুম্ভকর্ণ ও তাঁর প্রথম পত্নী বজ্রমালার কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে দুই পুত্রসন্তান ছিল। দুজনেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। পুরাণ মতে, কুম্ভকর্ণ সহ্যাদ্রির ডাকিন্যা অঞ্চলের (বর্তমান ওড়িশা) রাজকুমারী কর্কটীকেও বিয়ে করেন। তাঁদের ভীমাসুর নামে একটি পুত্রসন্তান হয়। স্বামীর মৃত্যুর খবর

শুনে কর্কটী রামের প্রতি প্রতিশোধ না নিয়ে বরং ভীমাসুরকে আদেশ দেন যেন সে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন এবং অমরত্ব লাভ করেন। তবে তাঁর আশা পূরণ হয়নি। তপস্যা অসমাপ্ত অবস্থায় ভগবান শিবের হাতে ভীমাসুর নিহত হন।

সেই মহাবীর কুম্ভকর্ণের কেলোর কীর্তি ঘুম নিয়ে সামাজিক মাধ্যেমে যতই অসামাজিক আলোচনা তেড়েফুঁড়ে উঠুক, ঘুমের প্রয়োজন নিয়ে কিন্তু বিস্তর খিল্লি সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে দেওয়ালে। পেঁচিয়ে পাঁচতারা করে কুম্ভকর্ণের ঘুমের যদি ব্যাখ্যা-বুলি আর ইংলিশ ঝাড়া যায়, তাহলে দাঁড়ায় সাউন্ড স্লিপ। এমন ঘুম, যার বিরতি নেই। গভীর ঘুম। প্রশান্তির ঘুম। দেহ-মন ঝরঝরে করে দেওয়া ঘুম। নিরবচ্ছিন্ন ঘুম। না-হলে দেহ-মনের ঘ্যাঁচাং ফু। বসন্তের যে সময়ে দিন-রাত সমান হয়ে যায়, তার ঠিক আগের শুক্কুরবার ঘুম দে-র জন্য নির্ধারিত। কী আদখেলেপনা রে বাবা। হাগ দে, জাপটে দে, কড়কে দে, কিস দে। এখন আবার ঘুম দে। মানে, এই দিনটা ঘুমোও আর বাকি ৩৬৪ দিন জেগে শত্তুরের শাপশাপান্ত করো।

তবে, তা যে হচ্চে, তা ভাবাটা স্রেফ কল্পনা-বিলাস। কারণ, ইশকুলেই শুনেছি পণ্ডিতমশাইয়ের নাসিকা গর্জন। এ কালের শিক্ষকরাও অবশ্য সময় পেলেই ঘুমিয়ে পড়েন ক্লাসরুমে। আমার প্রাইমারি স্কুলের বৃন্দাবন স্যরকেও নাক ডাকতে দেখেছি। তাতে অবশ্য বিদ্যা আহরণে খুব একটা ঝক্কি হয়নি। দুটো তেলমাখানো আস্ত বেত রাখা থাকত টেবিলে। ঘুমন্ত বৃন্দাবন স্যরের বদলে ওই দুখানা বেত্রশলাকা আমাদের পাহারায় রাখত। এ দেশের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা প্রজাতন্ত্রের গরিব কর্মচারী। লবণ আনতে পান্তা ফুরনোর দশা। ফলে, স্কুলে পাঠদানের বাইরেও রোজগারের ফন্দি-ফিকির করতে হয়। তার মধ্যে সকালের হালকর্ষণ থেকে শুরু করে রাতভর ধান মাড়াই পর্যন্ত রয়েছে। সুতরাং ক্লাসরুমে তাঁদের একটু আধটু ঝিম ধরে যায়। কিন্তু দেশের কোনও কোনও জনপ্রতিনিধি যখন সংসদের কক্ষদ্বয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং সশব্দ নাসিকা গর্জনে নিজেদের উপস্থিতির প্রমাণ দেন, তখন একটু নড়ে বসতে হয় বইকি!

আমরা নড়ে বসি। আমাদের দৌড় ওই ওইটুকুই। আমরা শুধু ভাবতে পারি, আহা, রাজনীতিক! আহা আমাদের অভিভাবক, দেশের মাঝিমাল্লা। দেশের কথা, জনগণের কথা ভাবতে ভাবতে বেচারারা শুদ্ধ ঘুমের সময়টুকু পান না। জনসমক্ষে ঝিমিয়ে পড়েন। এ দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কতই না ভাগ্যবান।

হে বীরপুঙ্গব, এ কালের কুম্ভকর্ণসকল, তাকান, জেগে উঠুন, কৃপাদৃষ্টি দিন। গনগনে আগুনেমার্কা ইস্যুগুলো ঝালিয়ে নিন। শুধু বাক্সপ্যাঁটরাভর্কি ভোট পেলেই তো হবে না। বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীফন্ত্রী হলেই তো হবে না। আমাদের দুঃখুদুদ্দশার করুণ কাহিনি তো আপনাদেরই শুনতে হবে। ইচ্ছে না থাকলেও শোনাবই। আমি কৃষক, আমি কুলি, আমি শ্রমিক, আমি মুচি, আমি মেথর, আমাদের নিশ্চিত ঘুমের দায়িত্ব তো আপনাদেরই নিতে হবে।

দরকারে আপনাদের ঘুম কমান। আমরা ঘুমোচ্চি কি না, খোঁজ নিন। অনেক হয়েছে ঘুম, এবার জাগুন। না হলে পরের ভোটে লে ছক্কা!

[বি. দ্র : *কুম্ভকর্ণ সংক্রান্ত অংশ নেহাতই কল্পনা-বিলাস, হাস্যরসের জন্য বানানে কিছু রদবদল তাই ইচ্ছাকৃত*]

***

চিত্রশিল্পীঃ
আরাধ্যা মজুমদার

ভালো থেকো তুমিও প্রাক্তন

বিজয় রায়

দীর্ঘ আট বছরের সম্পর্কের অবশেষে ২০১৩-য় বিচ্ছেদ, ওই বছরই তার বিয়ে হয়ে গেলো। ছেলে সরকারি চাকরি করে, ভালো টাকা মাইনে পায়। ঘর বাড়ি পাকা, গাড়ি আছে একটা। আর আমি তখনও বেকার, ভাঙাচোরা ঘর আমার।একটা ভাঙা সাইকেল ছাড়া আর কিছুই ছিলো না আমার। অবশ্য এসব নিয়ে জয়ার কখনও মাথাব্যথা ছিলো না।

ও বিয়ে আটকাতে অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। ওর বাবা মায়ের দেখা পাত্র এসে ওকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো আমার চোখের সামনে দিয়ে। টানা একটা বছর ওকে ভুলতে রোজ মদ খেয়েছি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি। চাইলেই কি এত সহজে সবকিছু ভোলা যায়! ও রোজ সময় পেলে আমায় ফোন করতো, বহুক্ষন চলতো আমাদের কথা।

জয়ার বিয়ে হওয়ার ঠিক দু'মাস পর আমি কাজ পেলাম, বেশ ভালো একটা কাজ। জয়াকে বলতেই ও খুব খুশি হয়েছিল। তবে ওর সেই খুশির মাঝে শুনেছিলাম অঝোরে ঝরে পড়া ওর চোখের জলের শব্দ। ও আমায় বলে উঠলো,"সেই তো কাজটা পেলে, দুটো মাস আগে কেন পেলে না?" আমি বলেছিলাম, "ভগবান চায়নি তাই!"খুব কেঁদেছিলাম ওর সাথে কথা বলতে বলতে।

তারপর আমি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, ওর সাথে আর কথা বলার সময়ই পেতাম না ঠিক মতো, তাতে অবশ্য ও রাগ করেনি কখনও। আমাদের কথা হতো রাত এগারোটারপর। আর এই নিয়েই ওর সংসারে অশান্তি শুরু হলো। ওর স্বামী ওর গায়ে হাত তুলতে লাগলো। ও যতটা না কষ্ট পেত তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেতাম আমি।

একদিন ও আমায় ফোন করে বললো," আমায় নিয়ে যাও তুমি, আমি ভালো নেই, একটুও ভালো নেই।" আমি ওকে বারবার বোঝাতে লাগলাম,"দ্যাখো এটা সম্ভব না,তুমি চলে এলে লোকে তোমায় খারাপ কথা বলবে,আর সেটা না তুমি সহ্য করতে পারবে আর না আমি সহ্য করতে পারবো।" জয়া কিছুতেই আমার কথা শুনতে রাজি নয়, অবশেষে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমি ওকে বললাম,"ঠিক আছে, আগামী রবিবার ঠিক বিকেল পাঁচটায় আমি তোমার জন্য রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করবো, তুমি তোমার যাবতীয় দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে এসো।" আমি ফোন রেখে দিলাম।

যথারীতি আমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। জয়াএলো। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, যে মেয়ে এই আট বছরের সম্পর্কে আমায় কখনও জড়িয়ে ধরেনি, সেই মেয়ে আজ এত লোকের সামনে জড়িয়ে ধরলো।

তারপর আমার হাত ধরে হাঁটতে শুরু করলো। আমি ওকে প্রশ্ন করলাম,"তুমি আমার সাথে সংসার করবে ঠিক আছে, তবে তোমার শ্বশুরবাড়ি আর তোমার মা, বাবার অভিশাপ সহ্য করে থাকতে পারবে তো? আমার বা আমার পরিবারের কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু, ভেবে দ্যাখো তুমি?" ও বললো,"আমি তোমার সাথে সংসার করবো,লোকে কি বললো তাতে কিছু যায় আসে না।" আমি বললাম,"বেশ চলো তাহলে।" হাঁটতে থাকলাম দু'জনে হাত ধরে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর জয়া আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আমায় বলে উঠলো, "তুমি ফিরে যাও জয়," আমি বলে উঠলাম, "মানে?" জয়া বললো, "তুমি ফিরে যাও,আমার কপালে যা আছে তাই হবে। আমার সাথে আর যোগাযোগ রেখোনা।আমি তোমাকে সবকিছু থেকে ব্লক করছি,ভালো থেকো।" আমি কিছু বলার আগেই ও দৌড়ে ট্রেনে উঠে চলে গেলো। আমি নির্বাকের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আর কথা হয়নি ওর সাথে আমার,বহুবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছি।

ভেবেছিলাম ওকে ভুলে যাব, কিন্তু ভোলা তো এত সহজ নয়। তাই ওকে দেখার জন্য বহুবার পাগলের বেশ ধরেছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই ও ধরে ফেলেছিল আমায়। আর প্রতিবারই নানান কথা শুনতে হয়েছিল। শেষবার যখন গিয়েছিলাম তখন ও দিব্যি দিয়েছিল, তারপর থেকে আর যাওয়া হয়নি। মানে ইচ্ছে করেই আর যাইনি। নিজের মনকে শান্তনা দিয়েছিলাম। ও ভালো আছে এই ভেবেই আমি ভালো থাকতাম।তারপর আর যোগাযোগ করেনি ও কোনোদিন।

তারপর হঠাৎ ২০১৫-র এপ্রিলের এক সন্ধেয় ওর নম্বর থেকে একটা ফোন এলো, আমি ফোন ধরতেই আমায় বললো,"মেয়ে হয়েছে পরশুদিন, আমরা দুজনেই ভালো আছি, চিন্তা করোনা" বলেই ফোনটা কেটে দিলাম। আমি ফোন করতেই বুঝলাম আমার নম্বরটা এখনও ব্লক হয়ে পড়ে আছে। তাই আর বৃথা চেষ্টা করলাম না।

তারপর ছ' মাস পর ফোন করে ডাকলো আমায়। আমি গিয়ে দেখলাম ও বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেতেই আমার কোলে দিয়ে বললো, "সাবধানে নিও।" আমি হা করে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ চোখে জল চলে এলো আমার। মনে মনে ভাবতে থাকলাম,"আজ যদি তুমি আমার সাথে সংসার করতে,তাহলে এই মেয়েটাই আমাদের হতো।" আমি বাচ্চাটাকে ওর কোলে দিয়ে এক ছুটে চলে এলাম। তারপর আর দেখা হয়নি আমাদের।

আজ চারবছর পর ওর সাথে দেখা।ও রিচার্জ করতে মোবাইলের দোকানে দাঁড়িয়ে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কাকতালীয়ভাবে আমিও রিচার্জ করার জন্য ওই দোকানেই উপস্থিত। যদিও ওকে খেয়ালই করিনি আমি। আমি দোকানদারকে আমার নম্বরটা বলতেই ও আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, আমিও মাথা উঁচু করে তাকিয়েই দেখি ও তাকিয়ে আছে। দু'জনের মুখেই কোনো কথা নেই। দু'জনেই চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মেয়েটা বলে উঠলো, "মাম্মা চলো,বৃষ্টি কমবে না আজ আর।"

আমি আমার ছাতাটা দিলাম ওর হাতে। ও ছাতাটা হাতে নিয়ে বলে উঠলো, "নিজের যত্ন নিও,ভালো থেকো।" আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না কেনো জানি না।বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে আপন মনে বলে উঠলাম,"ভালো থেকো তুমিও প্রাক্তন...”

"কখনও কখনও চোখের নোনা জলকে ঢাকতে, বৃষ্টি অথবা সাওয়ারের জলের সাহায্য নিই আমরা। এভাবেই কাছে না পাওয়া প্রিয় মানুষ গুলো থেকে যায় বুকের বাঁ পাশে, যাদের চাইলেও কখনও মোছা যায় না। শুধু মনে মনেই বলতে হয়, ভালোবাসি আজও সেই যেমনটা আগে বাসতাম। "

***

চিত্রশিল্পীঃ
শর্মিলা বিশ্বাস

নিয়তি

বীনা সেনগুপ্ত

সেবার কলিকাতায় খুব গরম পড়েছে। শোনা যাচ্ছে গ্রামের দিকেও সব পুকুর শুকিয়ে গেছে। মাঠে ধান নেই। মাটি ফেটে চৌচির। চাষীরা চাষ করবে কি; করবার শক্তিটুকুও নেই। আমি একটা ঘটনা লিখছি।

অনেকে অবশ্য বিশ্বাস করবে না। কোন লোক কাউকে জোর করে বিশ্বাস করাতে পারে না। বিশ্বাস করাটা নিজের মনের ব্যাপার। আধুনিক যুগ বিজ্ঞান দিয়ে তৈরি, বিজ্ঞান কখনও ভূত-পেত্নী বিশ্বাস করে না। অতএব এই বিজ্ঞান যুগের লোকেরা কোন ভৌতিক ব্যাপার বিশ্বাস করে না। কিন্তু কখনও কখনও বিশ্বাস করতে হয়। আমিও ঠিক ভূত-পেত্নী বিশ্বাস করি না। কিন্তু ভয় করি। কোন লোক যখন মারা যায় অপঘাতে অর্থাৎ অসময়ে, তখন মৃত্যুর সময় তার আত্মা অতৃপ্ত রয়ে যায়। তখনই সে নিজের আত্মাকে শান্তি দেবার জন্য ছায়ার আকারে তার ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। অতৃপ্ত আত্মার আবির্ভাব কে বলে ভূত। এই যা, আমি যে ঘটনা লিখতে যাচ্ছি এবং আমার আসল ঘটনা বাদ দিয়ে আমার বক্তব্য বলে যাচ্ছি। যাক, এবার আসল ঘটনায় আসি,

ওই যে বললাম কলকাতায় একবার খুব গরম পড়েছে। গরমের সময় রোগের প্রকোপ সাধারণত বেশি হয়। কলকাতা থেকে কিছু দূরে ফাঁকা জায়গায় কয়েকটা বাড়ি নিয়ে তৈরি ঠাকুর পাড়া। ছোট একটি পরিবার; বুড়ো মা, দুই বছরের শিশু, মাতা ও পিতা। সব জায়গায় কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। ঔষধে কাজ হচ্ছে না। হঠাৎ একদিন মা-র রাত্রে বমি, পায়খানা, ঘন ঘন হওয়ার পর মা হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৃদ্ধা কোনওরকমে সামলে উঠলেন। বৃদ্ধার পর রোগে পড়ল ছেলের বউ, কিন্তু ভাগ্য দোষে বউ কলেরায় মারা গেল। মারা যাবার সময় তার ছেলেকে সে দেখতে পেল না। কারণ ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন যে ছেলেকে মার কাছ থেকে দূরে রাখতে। যাবার সময় শুধু একটা কথা বলে গেছে; কাতরস্বরে – ‘ওগো তোমরা আমার ছোট খোকাকে একবার দেখাও তোমাদের পায়ে পরই। খোকার কলেরা হবে না, ওই খোকার ওপর আমার অনেক আশা ছিল, ভগবান আমায় ভালো করো।’ ‘হায় ভগবান’ মার এই কাতর ক্রন্দন কেউ শুনল না। এমনকি ভগবানও না। এদিকে খোকা ‘মা’-‘মা’ করে পাগল। খোকাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মামার কাছে। সেখানে খোকার মুখে এক কথা ‘আমার মার কাছে নিয়ে চলো।’ একদিকে মা বলে শুধু - ‘আমার খোকা’, ওদিকে খোকার ডাক ‘মা’ ‘মা’। ‘মা’ ছেলেকে না দেখতে পেয়ে নিরাশ হয়ে গেলেন। তার পর মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ মেটবার পর খোকাকে নিয়ে এল বাবার বাড়িতে। কিন্তু খোকা এই ঘর ওই ঘর করে মাকে শুধু খুঁজে বেড়ায়। বলে ‘ঠাকুমা, মা কোথায় গেল? মাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা আমার মাকে এনে দাও।’ ঠাকুমা শুধু নাতির দিকে চেয়ে থাকে আর আড়ালে কাঁদেন। বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে –

‘বাবা তোমরা আমার মাকে কোথায় রেখে এসেছ? আমার মাকে অনেক দিন দেখিনি। ওই ছবিতে মা কেন শুয়ে আছে? মা যে আমার জন্য কাঁদে বাবা।’ এই শিশুকে কেউ মার কথা মন থেকে মুছে দিতে পারে না। কিছুতেই ভোলে না। কত রকম কথা বলে সবাই। এক রাত্রে হঠাৎ ছেলে ‘মা’ ‘মা’ বলে ডেকে ওঠে ; ঘুমের ঘোরে বলতে থাকে, ‘মা আমায় তোমার কাছে নিয়ে চলো। তুমি দূর থেকে কেন দেখছ?’ বাবা ছেলের কথা শুনে উঠে পড়ে এবং জানলার দিকে তাকাতেই দেখা গেল আবছা একটা নারীমূর্তি। এইভাবে মা ও ছেলের দেখা হয় দূর থেকে। মা অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে ছেলের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছে হয় ছেলেকে কাছে পেতে। এইভাবে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। খোকাকে সান্তনা দিতে কেউ পারে না। ছেলে দুই বছর থেকে তিন বছরে পড়ল। এদিকে ছেলেকে কেউ ঘরে রাখতে পারছে না। ঠাকুমা একদিন দুপুর বেলায় খোকাকে একটা চর মেরে বললেন, ‘তোর মা তোকে নিয়ে গেলে বেঁচে যাই। মার ছেলে মার কাছেই থাকা ভালো।’ সেই রাত্রে ঠাকুমা ও বাবা একসঙ্গে স্বপ্ন দেখলেন, মা বলছে, ‘তোমরা আমার ছেলেকে দিয়ে দাও। আর আটকিও না। আমি আর থাকতে পারছি না’, বলে দুই হাত দিয়ে খোকাকে কাছে টেনে নিল। খোকার সকালবেলা থেকে খুব জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে। বাবা অফিস যাওয়া বন্ধ করল। ডাক্তার বসে আছে। যত বেলা বাড়ছে ততই খোকার জ্বর বাড়ছে ও ‘মা’ ‘মা’ বলে ডাকছে। প্রতিটি সেদিন ছিল মেঘলা আকাশ। বিকেলের দিকে ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। হঠাৎ খোকা বলে উঠলো, ‘মা এসেছে তুমি আমায় নিতে। নিয়ে চলো তোমার কাছে। বাবা বাবা ওই দেখো মা আমায় হাত নেড়ে ডাকছে। যাচ্ছি মা আমি তোমার কাছে।’ কিছুক্ষণের জন্য খোকার মুখে হাসি ফুটে উঠল তার পর সব শান্ত হয়ে গেল। তখনই খোকার মাথার কাছে মার ফটোটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। বাবা ‘খোকা’ বলে চিৎকার করে উঠল। ‘তুই আমায় ছেড়ে চলে গেলি খোকা? তুই যেমন তোর মার চোখের মণি ছিলি ; আমারও ছিলি এবার আমি কি নিয়ে থাকব? খোকা তুই আমার কথা চিন্তা করলি না? শুধু তোর মার কথা চিন্তা করলি? তোরা সবাই স্বার্থপর। বল আমি কি নিয়ে থাকব? ’ বাবা মৃত ছেলেকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

আর ঠাকুমা একেবারে ভেঙে পড়ল। একমাত্র নাতির জন্য। পাড়ার লোকেরা পিতাকে সান্তনা দিল। বাবা বৃষ্টিতে ভিজে ছেলেকে বুকে নিয়ে রওনা হল শ্মশানের দিকে চোখে জল ফেলতে ফেলতে।

ছেলেকে পুড়িয়ে বাবা ভোর রাত্রে ফিরল বাড়িতে, এবং তখন তিনি একদম অন্যরকম মানুষ। বাড়ি ফিরে ভাঙা ফটোর দিকে তাকিয়ে বাবা বলে উঠলেন, ‘তোর মা তোকে কোলে নিয়ে খোকা - এই ফটোটা তুলেছে। অনেকদিন মার কোলে উঠিসনি। সেই জন্য যাবার সময় জানিয়ে দিয়ে গেলি, ‘তুই তোর মার কোলে করে চলে গেলি।’ সত্যিই খোকা জানিয়ে দিয়ে গেল ও আবার মার কোলে উঠলো ফটোটা ভেঙে দিয়ে। তারপর ক্যালেন্ডার দেখল বাবা এই তারিখেই মা কলেরায় মারা গিয়েছিল এবং একই তারিখেই ‘মা’ ছেলেকে নিয়ে গেল।

***

চিত্রশিল্পীঃ সঙ্গীতা দাস

Aadhar এ আঁধারিত

সুনন্দ সান্যাল

কালীপুজোর রাত। শহরের এক চিত্রকার পার্থদীপ সান্যাল নিজের সৃষ্টির দিকে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে। সাদা ক্যানভাসে রঙ, তুলি ও পেন্সিলের সাহায্যে ফুটে উঠেছে এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলার ছবি। ছবিটিতে চক্ষুদান পর্ব শেষ করতেই ছবি যেন হয়ে উঠলো চিত্তাকর্ষক, অভূতপূর্ব। ছবিটি শেষ করে ছবির দিকে তাকিয়ে সিগারেটটা ধরিয়েছেন হঠাতই বাড়ির কলিং বেল বেজে উঠলো। "ধ্যুরর, এইসময় কে এল, সবে শেষ করলাম, একটু মন দিয়ে দেখব ছবিটা, থাক বাজুক বেল, আমার এই মূহুর্তে কারুর সাথে কোন দরকার নেই।" ছবিটার দিকে তাকিয়েই পার্থদীপ নিজেই নিজেকে বললো কথাগুলি। আবার কলিং বেল বেজে উঠলো। আবার পার্থদীপ নিজেকে বললো "না, দরজাটা খুলি, কোন প্রতিবেশীর কোন বিপদ হল কি না কে জানে, না গেলে খুব খারাপ হবে।" (জোরে চিৎকার করে) "আসছি, আসছি, একটু দাঁড়ান।" অর্ধসমাপ্ত সিগারেটটা ছাইদানিতে রেখে স্যান্ডো গেঞ্জির উপর একটা পাঞ্জাবী পড়তে পড়তেই বলে উঠলো পার্থদীপ। দরজার আই হোল দিয়ে উঁকি মারতেই পার্থদীপ দেখলো একজন মহিলা দরজার বাইরে পায়চারি করছেন কিন্তু দরজা খুলতেই চমকে উঠলো পার্থদীপ, আরে এই তো সেই মহিলা যার ছবি আমি আঁকলাম। আমি যখন আধার কার্ডের এজেন্সি নিয়েছিলাম তখন ইনি আমার কাছেই এসেছিলেন আধার কার্ড তৈরি করার জন্য, তাও তো দু-বছর হয়ে গেছে, আমি এজেন্সিও ছেড়ে দিয়েছি, এখন আবার কি জন্য আমায় প্রয়োজন? মহিলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে মনে মনেই ভাবতে লাগল পার্থদীপ।

মহিলা: (একটু মুচকি হেসে) ঘাবড়ে গেছেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, অতো বড়ো হাঁ করবেন না মশা, পোকা সব ঢুকে যাবে ভেতরে।চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই ।...পার্থদীপ: (মুখ বন্ধ করে কিন্তু অবাক হয়ে, তুতলিয়ে) হ্যাঁ, না, মানে হ্যাঁ, আ..আ..আপনি মানে...এখন..আ..আ..আমি...

মহিলা: (পার্থদীপকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে) কি হ্যাঁ, না,আমি,আপনি করছেন, কি হয়েছে আপনার শরীর ঠিক আছে তো? আমি আপনার কাছ থেকে আধার কার্ড করিয়েছিলাম, তখন তো আপনার আত্মবিশ্বাস আকাশছোঁয়া ছিল, এখন এমন কি হল যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। পার্থদীপ: (ধমক খেয়ে নিজেকে সামলে) না, আসলে এইসময় আপনি, তাও একা, আমার বাড়িতে, একটু হলেও আমার কাছে আশ্চর্যজনক। তাই, আর তা ছাড়া আমি আধারের এজেন্সি ছেড়ে দিয়েছি, আপডেটের জন্য আপনাকে....

মহিলা: (পার্থদীপকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে) ধ্যুরর, কি এমন সময় মাত্র ৯টা বাজে ঘড়িতে, আপনি একটা হোপলেস, আমি কি কালীপুজোর দিন, এইসময় আধার নিয়ে আলোচনা করতে এলাম? আর কেমন অভদ্র লোক বলুন তো আপনি, একজন মহিলাকে বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

পার্থদীপ: (একটু লজ্জিত হয়ে) এমা ছিঃ ছিঃ! সত্যি আমি খুব লজ্জিত, আপনি ভেতরে আসুন।(বাড়ির বসার ঘরের সোফার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে) আপনি বসুন। (জলের বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢেলে, মহিলার দিকে এগিয়ে) এই নিন জল। আপনি বসুন, আমি একটু চা করে নিয়ে আসি।

মহিলা: (হাতে জলের গ্লাসটা নিয়ে, সোফায় না বসেই, দেওয়ালে লাগানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে) আপনার আঁকার হাত কিন্তু অতি সুন্দর, সবকটা ছবি কতো প্রাণবন্ত।

পার্থদীপ: (একটু গর্বের হাসি হেসে) ধন্যবাদ, আপনি ছবিগুলো দেখুন আমি দেখি চা আর সাথে কি ব্যবস্হা করতে পারি।

মহিলা: (পার্থদীপের দিকে তাকিয়ে) শুধু চা, সাথে আর কিচ্ছু নয়, আর শোনো, এখন থেকে তুমি করে বলবো আমরা, ঠিক আছে।

পার্থদীপ মুচকি হেসে চা করতে চলে গেলেন। চা করে নিয়ে বসার ঘরে এসে পার্থদীপ দেখে সেখানে মহিলা নেই, চায়ের ট্রে হাতে নিয়েই বসার ঘরের পাশে স্টুডিও ঘরে গিয়ে পার্থদীপ দেখে মহিলাটি তাঁর ছবিটির সামনে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পার্থদীপ: (হাতের ট্রে টেবিলের ওপর রেখে, ছবিটার কাছে গিয়ে) এবার আশাকরি বুঝতে পারছো যে কেন আমি তোমায় দরজার বাইরে দেখে তখন অবাক হলাম। মহিলা: (ছবিটার দিকে তাকিয়ে, হেসে) হ্যাঁ বুঝলাম, ঠিকই তো কোন পুরোহিত প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদানের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবানের দর্শন পেয়ে যায়, তাহলে তাঁর ভিরমি যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এটাও তো ঠিক কতটা মনোনিবেশ করে একাত্ম হয়ে তবেই তো এত নিখুঁত সৃষ্টি হয়েছে। পার্থদীপ: (মহিলার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসিমুখে) তুমি যখন বলছো নিখুঁত তাহলে সেটাই ঠিক, আমার পরিশ্রম সার্থক হল।

মহিলা: (পার্থদীপের দিকে তাকিয়ে) আর ভালোবাসা সেটা সার্থক নয় ?....

পার্থদীপ: (মহিলার হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে, নিজে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললো) আমি শিল্পী, আমার শিল্পের প্রতি অগাধ ভালবাসা আছে ঠিকই কিন্তু যার ছবি আঁকলাম তার প্রতি সত্যি ভালবাসা আছে কি না জানি না তবে হ্যাঁ, ভাললাগা ছিল, হয়তো আছে...

মহিলা: (চায়ের কাপে দু বার চুমুক দেওয়ার পর) ভালোবাসা না থাকলে হঠাৎ করে দু বছর পর আমার কথা মনে করে ছবি আঁকলে কেন? আর আমিও এই অসময়ে তোমার সামনে এসে হাজির হলাম।এটা কি নিতান্তই ভাললাগার যোগাযোগ? দু বছর আগে আধার কার্ডের জন্য আমার আঙুলগুলো যখন স্পর্শ করেছিলে তখনই আমি বুঝেছিলাম, আমার প্রতি তোমার ভাললাগা আছে, এই স্পর্শটা মেয়েরা বুঝতে পারে, সেই ভাললাগা ক্রমে ক্রমে ভালবাসায় রূপান্তর হয়েছে আর সেই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এই ছবি।...

পার্থদীপ: (চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে, সিগারেট ধরানোর পর একটু গম্ভীর হয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে) এতটাই বুঝেছিলে যখন তাহলে পরে আর কোনো যোগাযোগের চেষ্টা করো নি কেন ? আমি আশা করেছিলাম, অপেক্ষাও করেছিলাম আর কেন করব না আধার কার্ডের প্রসিডিওরের শেষে তুমি যে হাসিটা দিয়েছিলে সেটা কি ভুলে যাওয়ার মত ছিল, সেই হাসিটাও ছবিতে তুলে ধরেছি।..

মহিলা: (ছবির পাশে চেয়ারে বসে) হ্যাঁ, সেই হাসিটা যে তোমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল তা ছবিটাতেই ব্যক্ত হয়েছে। আসলে একজনের অপেক্ষায় ছিলাম, আমার প্রেমিকের অপেক্ষায়। সে যে কর্মসূত্রে বিদেশে চলে গেল আর সাথে আমাকেও ভুলে গেল, আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড ইংরেজী এই প্রবাদটা ওর জন্য একদম ঠিক আবার দেখ এই প্রবাদটাই তোমার জন্য একেবারেই ভুল, তোমার জন্য আমিও তো আউট অফ সাইট ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় আউট অফ মাইন্ড করতে পারো নি। তাও মাত্র কিছুক্ষণের দেখা।

পার্থদীপ: (সিগারেটটা শেষ করে, জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে) যা বলছো তুমি, একদমই সত্যি, এ এক অসম্পূর্ণ ভালবাসা, নীরব ভালবাসা, যদি দু পক্ষেই এক অনুভূতি বর্তমান থাকে তাহলে.... মহিলা: (হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে, পিছন থেকে পার্থদীপকে জড়িয়ে পার্থদীপকে থামিয়ে দিয়ে) ..হ্যাঁ, আমার আর তোমার দুজনেরই একই অনুভূতি, চলো দুজন আজ দুজনকে যতটা পারি ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে দি, যেন এই ভালবাসায় কোনো ফাঁক না থাকে।

পার্থদীপ মহিলাকে জড়িয়ে ধরে এবং দুজন দুজনকে চুম্বন করে, পার্থদীপ বাঁ হাত দিয়ে ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে পার্থদীপ দেখে সে মাটিতে শুয়ে আছে, মহিলা বাড়ি চলে গেছে কিন্তু সেই মহিলার আধার কার্ডের এনরোলমেন্টের প্রিন্ট আউট কপি পড়ে আছে।..

মহিলার নাম শিঞ্জিনী গোস্বামী, বাড়ির ঠিকানা: ৪এবি, সুখলাল শেঠ সরণি, কলকাতা ২৯। পার্থদীপ ঠিক করে ছবিটি সে শিঞ্জিনীর হাতেই দিয়ে আসবে আর তার মনের কথাও সবাইকে জানিয়ে আসবে। নিজে প্রস্তুত হয়ে ছবিটিকে ভালো করে মোড়কজাতো করে সে বেরিয়ে পড়ে ৪এবি, সুখলাল শেঠ সরণির উদ্দেশ্যে, রিকশা করে যাওয়ার পথে কাজু বরফি মিষ্টি কিনে নেয় শিঞ্জিনীর বাড়িতে দেওয়ার জন্য, সে মনে মনে ঠিক করে সকালে শিঞ্জিনী কেন তাকে না বলেই চলে এল সেটা সে আলাদা করে জিজ্ঞেস করবে। বেশি কষ্ট করতে হয়নি পার্থদীপকে বাড়ি খুঁজে পেতে। বাড়ির বেল বাজতেই একজন বয়স্ক লোক দরজা খুলে পার্থদীপকে জিজ্ঞেস করেন “কি ব্যাপার, আপনি কাকে চাইছেন ?”

পার্থদীপ: (বাড়ির ভিতরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে) আমি পার্থদীপ সান্যাল, শিঞ্জিনীর বন্ধু। আজ শুভদিন তাই ভাবলাম একটু গল্প করে আসি। ..বয়স্ক লোক: (পার্থদীপকে ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে) এসো বাবা, এসো, আমি অমিয়রঞ্জন গোস্বামী, শিঞ্জিনীর বাবা। (চিৎকার করে) ও গো শুনছো, শিঞ্জিনীর বন্ধু এসেছে। বসার ঘরে বসার আগে পার্থদীপ অমিয়রঞ্জন গোস্বামীকে প্রণাম করে, মিষ্টির প্যাকেটটা দেয়।

অমিয়রঞ্জন গোস্বামী: (মিষ্টির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে, পার্থদীপের হাতের দিকে তাকিয়ে) এসবের কি দরকার ছিল, তাহলে দুপুরে খেয়েই যাও, হাতে অতো বড়ো জিনিসটা কি? বেশ কষ্ট হচ্ছে তোমার ওটা বইতে। রাখো, রেখে দাও।...পার্থদীপ: (একটু লাজুক হাসি হেসে) এই জিনিসটা যার জন্য আনলাম তাকে একটু ডেকে দিন, (মাথা চুলকিয়ে) মানে শিঞ্জিনীকে ডেকে দিন।

অমিয়রঞ্জন গোস্বামী: (অবাক হয়ে) কাকে ডাকব ?....পার্থদীপ: (গম্ভীর হয়ে) আপনার মেয়ে শিঞ্জিনী গোস্বামীকে, এই যে এই ছবি (ছবিটার মোড়ক খুলতে খুলতে) যার, আমার বান্ধবীকে।

অমিয়রঞ্জন গোস্বামী: (গম্ভীর হয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে) কাকে ডাকতে বলছো ?? তোমার ডানদিকের দেওয়ালে তাকাও।

পার্থদীপ ডানদিকের দেওয়ালে তাকিয়ে দেখে, শিঞ্জিনীর ছবিতে মালা দেওয়া আর নীচে ধূপকাঠি জ্বলছে।...অমিয়রঞ্জন গোস্বামী: (হতাশার সুরে) শিঞ্জিনী গোস্বামী আমার মেয়ে, প্রায় একবছর হল একটা পথদুর্ঘটনায় মারা গেছে, যার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সেও মেয়েটাকে ঠকিয়েছে আর জীবনও মেয়েটাকে ঠকিয়েছে, ওর নিয়তি ছিল মৃত্যু।

পার্থদীপ ছবিটা ওখানেই রেখে ছুটতে ছুটতে নিজের বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে আর ভাবতে থাকে তাহলে কাল রাতে কি হল, বাড়ির কিছুটা কাছে আসতেই পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা পথ আটকে বললো "কাকু, কাল রাতে আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম চাঁদার জন্য, কত বেল মারলাম আপনি তো দরজাই খুললেন না।" পার্থদীপ কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে পকেটের থেকে ১০০ টাকা বের করে ওদের হাতে দিয়েই আবার ছুটতে ছুটতে বাড়ি পৌঁছে দেখলো বসার ঘরের জলের বোতলে জল কানায় কানায় পূর্ণ, গ্লাসটি উল্টে রাখা আছে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখে চায়ের ট্রে - তা যথাস্থানেই অব্যবহৃত অবস্হায় পড়ে আছে। স্টুডিও রুমের টেবিলে চা-য়ের একটাই কাপ রাখা, ছাইদানিতে একটি অর্ধসমাপ্ত সিগারেট, আর মাটিতে শিঞ্জিনীর আধার কার্ডের এনরোলমেন্টের প্রিন্ট আউট কপি পড়ে আছে। কালীপুজোর রাতে ঠিক কি হয়েছিল আজও বুঝে উঠতে পারেনি পার্থদীপ সান্যাল।

(সিগারেট খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকারক)

***

চিত্রশিল্পীঃ সায়নী মন্ডল

চিত্রশিল্পীঃ পৌলোমী নিয়োগী

শুভ দীপাবলীর, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন

+91- 9903129991

boikutirkolkata@gmail.com

https://www.facebook.com/Boi-kutir-kolkata-বই-কুটির-কলকাতা-123508622632570/

https://www.boikutirkolkata.co.in

https://www.instagram.com/Boi_Kutir_Kolkata/